পরমাণুর রূপকথা

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

পরমাণুর রূপকথা

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক / কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

PARAMANUR RUPKATHA
By Santosh Chattopadhyay

প্রচ্ছদ / সত্য চক্রবর্তী

গ্রন্থের অন্যান্য চিত্র লেখক কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম প্রকাশ / পৌষ ১৩৮৮, জানুয়ারী ১৯৮২

দ্বিতীয় মুদ্রণ / জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬, মে ১৯৮৯

পত্রপুট

প্রকাশিকা / আরতি চক্রবর্তী, পত্রপুট, ৩৭/৯ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রক / বিজয় চক্রবর্তী, মুদ্রণায়ন, ৩৭/৯ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

পনের টাকা

পরমাণু বোমায় নিহত

হিরোসিমা ও নাগাসাকির

অসংখ্য নিরীহ মানুষের উদ্দেশ্যে।

পত্রপুট প্রকাশিত

ফ্রেডরিক ফরসাইথ-এর

দি শেফার্ড

ওডেসা ফাইল

ডগস অফ ওয়ার

ডেভিলস অলটারনেটিভ [যন্ত্রস্থ]

॥ এক ॥

গোড়ার কথা

এক যে ছিলো ··· ।

শুরু হলো এক আশ্চর্য রূপকথা।

কিন্তু এ রূপকথায় না আছে কুঁচবরণ রাজকন্যা, না আছে রাজা, রাণী, মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র মিত্র—না, তারা কেউই নেই। এ গল্পের নায়ক শুধু পদার্থের অসংখ্য ছোট্ট সূক্ষ্ম কণা—যাঁর নাম পরমাণু। এই পরমাণুর মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে যেন হাজার লক্ষ কোটি রাক্ষসীর প্রাণ। এর মধ্যে সুপ্ত যে এক প্রচণ্ড শক্তি—তার পরিমাপ? না, কেউ তা আজও করতে পারেনি।

সেই প্রচণ্ড শক্তিই মহাবিশ্বের সব রহস্যের চাবিকাঠি। পরমাণুই মানুষের সামনে খুলে দিয়েছে মহাবিশ্বের সব রহস্যের দরজা।

এই পরমাণুর ইতিহাসই মানুষের জয়যাত্রারই ইতিহাস—মানুষের দুর্দম বেগে এগিয়ে চলারই কাহিনী।

আবার, কে জানে হয়তো এই পরমাণুই একদিন হয়ে দাঁড়াবে সমস্ত মানুষের নিয়তি—সেই হবে হয়তো তার সব মূর্খতার এক প্রতীক।

এ গল্পের শুরু সেই কবে কোন্ আদ্যিকালে।

ছোট্ট এই কণার কথা প্রথম জাগে গ্রীস দেশের এক দার্শনিকের মাথায়। তখন থেকেই এর শুরু। তারপর পঁচিশ শতাব্দী ধরে ক্ষ্যাপার মতোই মানুষ খুঁজে ফিরেছে এই পরশপাথর।

সে খোঁজার শেষ কোথায়?

সে খোঁজার শেষ হলো পরমাণু বোমা আবিষ্কারের মধ্যে।

কে বলতে পারে মানুষ একদিন নিজের আবিষ্কারের হাতেই শেষ হবে না! এ যেন সেই দৈত্য ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। এই পরমাণুই হয়তো মানুষের জীয়ন-কাঠি আর মরণ-কাঠি!

পরমাণুর এই জীবনকথা সত্যিই যেন এক রূপকথা। রূপকথার মতোই তার আমেজ।

আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা।

বিজ্ঞান তখন নেহাতই শিশু। একেবারে হাঁটি হাঁটি পা পা।

প্রাচীন গ্রীস দেশ। জ্ঞানে গরিমায় সে যেন সারা পৃথিবীরই মুখপাত্র। যীশুখ্রীস্ট তখনও জন্মগ্রহণ করেননি। খ্রীস্টধর্মও প্রচার হয়নি। এরও পাঁচশো বছর আগের কথা। গ্রীস দেশের এক দার্শনিক, অ্যানাক্সাগোরাসের মাথায় প্রথম একটা গোলমেলে চিন্তা দেখা দিলো। যে অনুসন্ধিৎসার আলো এর ফলে তিনি জ্বাললেন তার আড়াই হাজার বছর পরেও জ্বলতে লাগলো তার শিখা।

অ্যানাক্সাগোরাসের মাথায় মাঝেমাঝেই বিচিত্র সব উদ্ভট চিন্তা জেগে উঠতো। লোকে বলতো পাগলা বুড়ো। হঠাৎ তিনি একদিন ভাবতে বসলেন পৃথিবীর সব পদার্থ কি দিয়ে তৈরি। ভাবতে ভাবতেই তিনি একখণ্ড সোনার টুকরো হাতে তুলে নিলেন।

তারপর ?

তারপর বুড়ো অ্যানাক্সাগোরাস যা করতে শুরু করলেন লোকে দেখতে পেলে সেকালে নিশ্চয়ই তাঁকে পাগলাগারদেই পুরে দিতে চাইতো।

অ্যানাক্সাগোরাস কি করেছিলেন ?

তিনি ঐ সোনার টুকরোটা ভেঙে দু টুকরো করলেন। তারপর অর্ধেকটা নিয়ে আবার দু টুকরো করে ফেললেন। তারপর আবার তার অর্ধেককে দু টুকরো। তারপর তার অর্ধেককে দু টুকরো। তারপর আবার···তারপর আবার··· আবার ·· আবার।

বনবন করে অ্যানাক্সাগোরাসের মাথা ঘুরতে লাগলো। চিন্তা করতেই যেন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে চায়।

কোথায় এর শেষ অ্যানাক্সাগোরাস ভেবে ভেবেও কোন থই পেলেন না। তিনি যা বুঝলেন তা হলো পদার্থকে ভেঙে শেষ করা অসম্ভব। পদার্থ যে কোন ছোট সূক্ষ্ম কণায় তৈরি এ কথাটা তাঁর মাথায় আসেনি।

কিন্তু যাই বলো অ্যানাক্সাগোরাসকে তোমরা দোষ দিতে পারো না। এর

কারণ হলো খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকে পদার্থ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এর চেয়ে বেশি তো আর এগোয়নি। বেচারি অ্যানাক্সাগোরাস। এর চেয়ে বেশি কিছু ভেবে নেওয়া তাঁর উপায় ছিলো না।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলো না। অ্যানাক্সাগোরাস না পারলেও আর একজন গ্রীক পণ্ডিত মানুষ কিন্তু পদার্থের গঠন নিয়ে ভেবেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর দু হাজার বছরের আগে সে ভাবনার কোন তুলনা মেলেনি।

সেই মহাপণ্ডিত দার্শনিকের নাম ডেমোক্রিটাস।

মানুষের ইতিহাসে মাঝেমাঝেই কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মান। তাঁরাই মানুষের জ্ঞানচক্ষুকে খুলে ধরতে সাহায্য করেন। এইরকমই মানুষ নিউটন আর আইনস্টাইন, দুই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী।

আবার এইরকমই মানুষ ডেমোক্রিটাস।

আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞানের আদিপুরুষ এই ডেমোক্রিটাস। তিনিই প্রথম বললেন পদার্থ ছোট ছোট সূক্ষ্ম কণায় তৈরি। ডেমোক্রিটাসের মতে ওই ছোট কণারাই পদার্থের শেষ কথা।

গ্রীক ভাষায় তিনি এর নামকরণ করলেন অ্যা-টমস বা যা কাটা যায় না।

এই ভাবেই জন্ম হলো অ্যাটম বা পরমাণুর।

সে সময় অনেকে আপত্তি করতেও ছাড়লেন না ডেমোক্রিটাসের কথার। কিন্তু কেউই তাঁর যুক্তি খণ্ডন করতে পারলো না। বেশির ভাগ মানুষই শেষ অবধি তাঁর কথাই মেনে নিলো। বিখ্যাত রোমক কবি লুক্রেটিয়াস তো ছখানা বই-ই লিখে ফেললেন পরমাণুকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু হলে হবে কি। নিন্দুকেরও অভাব ছিলো না।

অ্যানাক্সাগোরাসের শিষ্যরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠলো ডেমোক্রিটাসের ওই তত্ত্বের উপর।

তারা ধরেই নিয়েছিলো পদার্থের শেষ নেই—তাকে ভেঙে শেষ করা নেহাতই পাগলের প্রলাপ। আর অ্যাটম বা পরমাণু? নেহাৎ ধোঁকাবাজি।

ব্যাপারটার হয়তো ওখানেই নিষ্পত্তি হতো। কিন্তু তা আর হলো না। পরমাণু নিয়ে তর্কবিতর্ক সমানেই চললো। সেও আর এক মহাপণ্ডিত

গ্রীকের জন্যেই। তিনি আর কেউ নন, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের শিক্ষাগুরু দার্শনিক অ্যারিস্টটল।

অ্যারিস্টটল মহাজ্ঞানী দার্শনিক, দুনিয়াজোড়া তাঁর নাম। তিনি ফতোয়া জারি করলেন অ্যানাক্সাগোরাসের কথাই বিলকুল ঠিক—পদার্থকে ভেঙে শেষ করা যায় না।

ব্যাস্ আলিবাবার রত্নগুহার দরজাটাই যেন খুলতে খুলতে বন্ধ হয়ে গেলো দু হাজার বছরের জন্য।

এর জন্যে দায়ী হয়ে রইলেন কিন্তু ওই পণ্ডিত অ্যারিস্টটল। তিনিই পথ আটকে দাঁড়ালেন সকলের।

কিন্তু তাই বলে কি পরমাণু সত্যি নয়? পরমাণু কি? এ কি সত্যিই আছে, না মানুষের অলীক কোন বাজে কল্পনা?

আজকের বিজ্ঞানের এত উন্নতির দরুন খুব শক্তিশালী যন্ত্র আবিষ্কার হওয়া সত্বেও কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজও পরমাণুকে চোখে দেখতে পাননি।

পরমাণু তাই যেন নিছক একটা বিশ্বাস।

পরমাণুকে দেখতে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতেও হয়তো নেই। তবুও বিজ্ঞানীরা পরমাণুকে একটা নীতি না বলে নিছক এক সত্যতেই রূপ দিতে পেরেছেন।

চোখে না দেখতে পেলেও পরমাণু ধ্রুবতারার মতোই সত্য। উজ্জ্বল আর অবিনশ্বর!

কিন্তু জানো কি এ বিশ্বাস এ সত্যের জন্ম হলো কেমন করে?

তাহলে চলো আবার ফিরে যাই পথ পরিক্রমায়। ফিরে যাই আবার সেই ডেমোক্রিটাসের কথায়।

প্রথম দিকে পরমাণু ছিলো ডেমোক্রিটাসের কাছে একটা আলোক-বর্তিকার মতোই একটা ধারণা। চুলচেরা যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়েই ডেমোক্রিটাস পদার্থের মূলে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। অ্যানাক্সাগোরাসের মতো তিনিও হয়তো কোন এক সোনার টুকরোকে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর যুক্তির সার কথা বুঝতে চেয়েছিলেন। ডেমোক্রিটাস বিশ্বাস করতে পারেননি মহান সুন্দর এই বিশ্বের সব পদার্থ আকারবিহীন কোন কিছুতে তৈরি।

ডেমোক্রিটাস ভাবলেন কোথাও কোন এক নিয়ম-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। তিনি নিশ্চিত হলেন পদার্থের একটা শেষ কথাও আছে।

সেই শেষ কথা কি ?

সেই শেষ কথাই হলো পরমাণু। যার ধ্বংস নেই পরিবর্তনও নেই। কোন বিশেষ পদার্থের পরমাণুর পরিবর্তন হতে পারে না। এ যদি না হয় তাহলে যে কোন পদার্থের স্থায়িত্ব থাকে না। আর ওই স্থায়িত্বটুকুই তাদের বৈশিষ্ট্যের মূল কথা।

ডেমোক্রিটাসের মনে পরমাণুর ওই ধারণাটা জন্মালো কি ভাবে ?

এর জবাব হলো, ওই ধারণা জন্মায় স্রেফ যুক্তির ওপর নির্ভর করেই। কারণ হাজার হাজার বছর আগে সেকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার তো কোন রকম উপায় ছিলো না।

এখানেও এক আশ্চর্যের কথা।

ডেমোক্রিটাসের পরমাণু তত্ত্বের সঙ্গে এ ব্যাপারে আরও একজন মহা-বিজ্ঞানীর যেন অদ্ভুত মিল।

সেই মহাবিজ্ঞানীর নাম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। পদার্থ আর শক্তির পরস্পর বিবর্তনের সম্বন্ধে সে তত্ত্ব রেখেছিলেন তিনিই।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের সম্বল কি ছিলো জানো ?

একটা পেনসিল, এক খণ্ড কাগজ আর তাঁর মগজ। ব্যাস্ শুধু ওইটুকু নিয়েই দুনিয়া তোলপাড় করেছিলেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন পদার্থকে ধ্বংস করা সম্ভব আর তাকে ধ্বংস করলে নির্গত হয় ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড এক শক্তি।

আর ?

আর ঠিক এই ভাবেই খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকে ডেমোক্রিটাস জানালেন পদার্থের শেষ কথা পরমাণু। তাঁরও সম্বল ছিলো শুধু একটা পালকের কলম, এক টুকরো পাথর আর আর তাঁর মগজ।

তবে দুর্ভাগ্যের কথা ডেমোক্রিটাসের কথা শোনবার জন্যে আইনস্টাইনের শ্রোতাদের মতো শ্রোতার দল যে হাজির ছিলো না।

ফলে কি হলো জানো ?

ফল হলো ডেমোক্রিটাসের পরমাণু তত্ত্ব প্রায় দু হাজার বছরের জন্য অন্ধকারে চাপা পড়ে গেলো। এর সঙ্গে আরও চাপা পড়ে গেলো ওই মহাপণ্ডিতের আরও দুটো মূল্যবান তত্ত্ব। তা হলো ডেমোক্রিটাসের মৌলিক পদার্থ আর যৌগিক পদার্থের ধারণা।

তিনি বলেছিলেন কোন কোন পদার্থ শুধু এক রকম পরমাণুতেই তৈরি আর অন্য আর এক রকম পদার্থ নানা ধরনের পরমাণুতে তৈরি।

এবার সত্যিই নেমে এলো এক অন্ধকারময় যুগ।

ওই অন্ধকারময় যুগের জন্য দায়ী সেই গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল।

মানুষ দীর্ঘকাল ধরেই বুঝে উঠতে পারেনি পদার্থের গঠনের রহস্য কোথায়। শেষ পর্যন্ত উনিশ শতকে জন ডালটন নামে একজন বিজ্ঞানী সব রহস্যের সমাধান করেন।

কিন্তু কি দুঃখের কথা দেখো—খ্রীস্টপূর্ব চার শতকে ডেমোক্রিটাসকে লোকে যদি একটু বিশ্বাস করতে পারতো, একটু ধৈর্য ধরে তার কথা শুনতো তাহলে এতকাল অপেক্ষার দরকারই হতো না।

ডেমোক্রিটাসের তত্ত্বের ওপর পণ্ডিত অ্যারিস্টটল তো ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠেছিলেন। অ্যারিস্টটল বোঝালেন সারা দুনিয়ায় মাত্র চারটি জিনিসই আছে—আগুন, জল, বাতাস আর মাটি। ব্যাস্ এগুলোই হলো সব পদার্থের মূল কথা।

বিশেষ বিশেষ পদার্থ ওই চারটি জিনিসের যে কোন কয়েকটার সংমিশ্রণেই তৈরি। আর মানুষ হলো সব সেরা সংমিশ্রণ।

এ রকম কিছু কথা আমাদের ভারতবর্ষের মুনি ঋষিরাও বলে গেছেন অনেক অনেক বছর আগে। তাঁদেরও মতে পৃথিবীর সব কিছুর মূল পাঁচটি বস্তু—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

অ্যারিস্টটল যা বললেন তাতে বেশ একটা মজার অবস্থাই সৃষ্টি হতে চাইলো। মানুষ ভাবলো সব পদার্থের মূল কথা যদি শুধু ওই চারটে জিনিসই মাত্র হয় তাহলে তো লোহা, তামা, সীসে এগুলোকে সোনায় বদলে নেওয়া সম্ভব।

মানুষের লোভ জেগে উঠলো এবার। কাজ হলো শুধু ধাতুগুলোর গঠন

একটু ওলটপালট করে দেওয়ার চেষ্টা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই মানুষ তাই একটা মাত্র চিন্তাতেই মশগুল হয়ে রইলো। নেমে এলো এক অন্ধকারময় যুগ। যাঁরা এ ধরনের পরীক্ষায় মেতে উঠলেন তাঁদের বলা হতো অ্যালকেমিস্ট বা অপরাসায়নিক। তাঁদের কাজের নাম হলো অ্যালকেমি। অপরাসায়নিকদের চেহারা আর পোশাক ছিলো মজাদার। তারা পরতো খুব ঝলমলে আলখাল্লার মতো পোশাক। মুখে থাকতো লম্বা দাড়ি।

ওরা শত শত বছর ধরে এক টুকরো সোনা তৈরির আশায় প্রাণপাত পরিশ্রম করে চললো। কিন্তু হা হতোস্মি।

কিন্তু ইতিমধ্যে সত্যিকার বিজ্ঞান কিন্তু পড়ে রইলো একেবারে অনাথ অবহেলিত হয়ে।

তখন মধ্যযুগ। বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করতেন তাঁরা মুখ খুলতে মোটেও সাহস পেতেন না—এতে যে প্রাণ হারাবারও ভয় ছিলো। অতএব মধ্যযুগে বিজ্ঞান আলোচনা একেবারে অচল অবস্থাতেই এসে দাঁড়ালো। ধর্মের গোঁড়ামিও এর জন্য বেশ কিছুটা দায়ী ছিলো।

অনেক অনেক বছর ধরেই চলতে লাগলো ওই অবস্থা।

তারপর ?

তারপর অন্ধকারের পর যেমন দেখা দেয় আলোর রেখা তেমনভাবেই সারা ইউরোপ জুড়ে এলো এক নব যুগের আবহাওয়া বা শিক্ষার নবযুগ। ইংরাজিতে যার নাম রেনেসাঁ। নতুন শিক্ষার আলোয় মানুষের মন পুরনো দিনের সব পাথর চাপা অন্ধকার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলো। অ্যারিস্টটলের মতকে নতুন শিক্ষার আলোয় তারা ছুঁড়ে ফেলে দিতে শিখলো। তারা চাইলো প্রকৃত সত্যকে আঁকড়ে ধরতে।

ওই মনোভাবকে কোন্ জিনিস বা ধারণা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো জানো ? সেই ডেমোক্রিটাসের পরমাণু তত্ত্ব।

আর সেই গোঁড়া কুসংস্কার আর মতের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এমন একজন যিনি ছিলেন এক মহা পণ্ডিত মানুষ। তাঁর নাম ফ্রান্সিস বেকন।

বেকন ছিলেন একজন আইনজ্ঞ আর রাজনীতিক। ইংল্যাণ্ডের রাণী

এলিজাবেথ আর রাজা প্রথম জেমসের সভাসদ ছিলেন বেকন। ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি লড়াই শুরু করে দিলেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই অ্যারিস্টটলের মতবাদের নিন্দা করতে লাগলেন। সে যুগে যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন তাঁদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে চাইলেন বেকন। তিনি সোজাসুজি ডেমোক্রিটাসের মতকে সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন।

এতে কি রকম দাঁড়ালো ব্যাপারটা?

ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে চারদিকে সাড়া পড়ে গেলো। অ্যালকেমিস্ট বা অপরাসায়নিকদেরও ছাড়লেন না ফ্রান্সিস বেকন, তাদেরও একহাত নিলেন তিনি। তিনি দাবি জানালেন পরীক্ষা আর প্রমাণ চাই। বিনা পরীক্ষায় কোন মতবাদ মানছি না। এসব বুজরুকি।

বেকন যদিও কোন বিজ্ঞানী ছিলেন না বা গবেষণাও করতেন না। তবুও তাঁর যুক্তিকে কেউ খণ্ডন করতে পারলো না।

ফলে কি হলো?

ফলে হলো কি বেকনের কথায় সব বিজ্ঞানীরাই দারুণভাবে পরীক্ষায় নির্ভর করতে শুরু করলেন।

ভারি মজার ব্যাপারই এবার ঘটতে শুরু করলো।

এরকম একজন বিজ্ঞানী এবার এগিয়ে এলেন। তিনি আয়ারল্যাণ্ডের লোক। নাম রবার্ট বয়েল।

বয়েলের কাজ ছিলো নানা ধরনের পাম্প নিয়ে নাড়াচাড়া করা। কিন্তু এ সত্বেও তাঁর আসল আগ্রহ ছিলো গ্যাসীয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা। পাম্পের মধ্যে গ্যাস ভরে তাতে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন ভারি একটা মজার ব্যাপারই এতে ঘটে। তিনি দেখতে পেলেন গ্যাসের আয়তন চাপের ওপর নির্ভরশীল। চাপ বাড়ালে গ্যাস আয়তনে কমে আবার চাপ কমালেই তা আবার আগেকার আয়তন ফিরে পায়। বয়েল দেখলেন সব গ্যাসই ওই নিয়ম মেনে চলে।

বয়েল গ্যাস সম্বন্ধে যে নিয়ম লক্ষ্য করলেন সেই নিয়মই আজও বয়েলের সূত্র বা 'বয়েলস ল' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

আসল মজার ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়ালো এবার অন্য রকম।

বয়েল যা বুঝলেন তা হলো, গ্যাসের মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম কণা আছে আর তারা আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে—মাঝখানে আছে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা তাই চাপ দিলেই মাঝখানের ফাঁক কমে গিয়ে সূক্ষ্ম কণাগুলো এক জায়গায় জমা হয়, আবার চাপ কমালেই কণাগুলো আগের জায়গায় ফিরে যায়। আর ওই গ্যাস পাত্রের গায়ে অনবরত ধাক্কা দিতে থাকে।

এই ব্যাপারটা যেন একটা মুখ ঢাকা কৌটোর মধ্যে একঝাঁক ক্ষ্যাপা মৌমাছি আটকে রাখার মতো। চাপ দিলেই মৌমাছিরা এক জায়গায় জমা হয় আবার চাপ কমালেই তারা আবার উড়তে উড়তে ছড়িয়ে পড়ে।

এবার আসল ব্যাপারটা বুঝলেন বয়েল। শুধু গ্যাস নয়। গ্যাস, তরল বা কঠিন, যে কোন পদার্থ ই হোক না কেন, তাদের সকলের মধ্যের রহস্যই হলো ওই সূক্ষ্ম ছোট ছোট কণা। তফাত যা কিছু তা এদের আয়তনেই, এই যা।

তাহলে দেখো, বয়েল ঘুরে ফিরে সেই ডেমোক্রিটাসের তত্ত্বেই ফিরে গেলেন। বয়েলের ওই সূক্ষ্ম কণাই হলো ডেমোক্রিটাসের পরমাণু।

বয়েলকে সমর্থন জানালেন এবার একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী।

তিনি কে জানো ? স্যার আইজ্যাক নিউটন।

হ্যাঁ, সেই বিখ্যাত জ্ঞানপিপাসু নিউটন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা আবিষ্কার করে যিনি দুনিয়া তোলপাড় করেছিলেন।

নিউটন ছিলেন ইংরেজ। গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন মাধ্যাকর্ষণের সূত্র।

নিউটন বয়েলের গ্যাসের ছোট্ট সূক্ষ্ম কণার তত্ত্ব সমর্থন করলেন। পরমাণুকেও তিনি বললেন পদার্থের ছোট্ট কণা।

তখন সপ্তদশ শতাব্দী কিন্তু শেষের দিন গুণে চলেছে।

ডেমোক্রিটাসের পরমাণু তত্ত্বকে আবার বাঁচিয়ে তুললেন প্রথমে তাহলে দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন। তারপর দুজন বিখ্যাত গবেষক, রবার্ট বয়েল আর স্যার আইজাক নিউটন।

ইতিমধ্যে কতদিন কেটে গেছে। সবেমাত্র যেন চলতে শিখেছে মানুষ। দু হাজার একশো বছরের মধ্যে এই প্রথম মানুষের পা পড়লো শক্ত মাটিতে।

পরমাণু আবার চিন্তার ঝড় তুলে তাকিয়ে রইলো আগামী কালের দিকে।

॥ দুই ॥

রহস্যময় দাহিকা

অন্ধকার বুঝি একটু একটু করে তরল হতে চাইলো এবার।

আঠারো শতক শুরু হলো।

বিজ্ঞান এতদিনে তার দুর্দিন কাটিয়ে অ্যারিস্টটলের গোঁড়ামি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন আশায় দিন গুনতে শুরু করেছে। ডেমোক্রিটাসের সেই পরমাণু তত্ত্বও মোটামুটি সকলেই মেনে নিয়েছে।

পরমাণু তত্ত্ব যেন এক নতুন দিগন্তের দরজা খুলে দিতে প্রস্তুত হয়ে উঠলো।

এই আঠারো শতকেই ইংল্যাণ্ডে জন্মালেন দু-দুজন প্রখ্যাত গবেষক আর বৈজ্ঞানিক।

তাঁদের নাম?

তাঁদের নাম ছিলো যোশেফ প্রিস্টলে আর হেনরি ক্যাভেনডিস।

কিন্তু…।

কিন্তু তবুও কোথাও যেন একটু বাধা। সব মিটলো কই?

এবার এগিয়ে এলেন একজন ফরাসী বিজ্ঞানী। আঠারো শতকের তখন প্রায় অনেক বছর কেটে গেছে। শতাব্দী তখন শেষ হওয়ার মুখে।

এবার সেই ফরাসী বিজ্ঞানীর কথা।

তাঁর নাম আঁতোয়া লুরেত লাভোসিয়ে। লাভোসিয়েই মানুষের মনের সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করে পরমাণু গবেষণার দরজা খুলে ধরতে সাহায্য করলেন।

ততদিনে কিন্তু পরমাণুকে এক রকম মেনে নিয়েছে মানুষ। এবার করণীয় হলো ওই পরমাণু কত রকমের থাকা সম্ভব সেটুকু জানা। অসংখ্য বিচিত্র সব পদার্থের মতো এই পরমাণুও কি অসংখ্য রকম? নাকি কিছু নির্দিষ্ট পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য আছে—যাকে বলা যেতে পারে মৌলিক

পদার্থ—যারা পরস্পর মিলেমিশেই তৈরি করে নানা পদার্থ ?

এর কিন্তু একটা উত্তর দিয়েছিলেন সেই ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল ১৬৭৯ সালে। মৌলিক পদার্থ বলতে তিনি বলেছিলেন কিছু আদিম সহজ অমিশ্রিত পদার্থ—যার সঙ্গে অন্য পদার্থের সংমিশ্রণেই তৈরি হয় হাজারো বস্তু বা পদার্থ। তাই, কয়েকটা পদার্থের প্রকৃতি জানলেই সব ব্যাপারটাই জানা সম্ভবপর।

মজার কথা হলো, সেই কয়েকটা পদার্থ কি ?

অ্যারিস্টটলের ভূত তো পুরোপুরি ঘাড় থেকে তখনও নামেনি মানুষের। তার সেই আদি চারটে জিনিস, বায়ু, মাটি, আগুন আর জল আবার ফিরে আসতে চাইলো।

নাঃ, এ সমস্যার বুঝি সমাধান নেই।

তাহলে ?

দু-দুটো দলই এবার তৈরি হয়ে গেলো। একদল সেই অ্যারিস্টটলের মতটাকেই আবার জাহির করতে কোমর বেঁধে লেগে পড়লো।

এবার আঠারো শতকের একটু গোড়ার দিকের কিছু কথা।

১৭২৯ সাল।

জর্জ আর্নস্ট স্টল। প্রুশিয়ার রাজার একজন চিকিৎসক মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এলেন।

ধাতুর দহন আর জারণ, অর্থাৎ অক্সিজেন যুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু বহুকাল ধরে অ্যারিস্টটলের মতবাদ মেনে চলা মানুষদের ভাবিয়ে তুলেছিলো। তারা ব্যাপারটা একেবারেই বুঝে উঠতে পারেনি।

মৌলিক পদার্থের তালিকার শূন্যস্থানগুলো ভরিয়ে তুলতে এবার স্টল বেশ একটা মজার জিনিস চাপিয়ে দিলেন। জিনিসটা তাঁর মতে ছিলো স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, আর ওজনবিহীন।

জিনিসটা কেমন মজার ভাবো একবার।

ওই অদ্ভুত জিনিসটার স্টল নামকরণ করলেন ফ্লজিস্টন বা দাহিকা।

এবার ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

স্টল বোঝালেন কোন কোন পদার্থের দাহিকা আছে, কারো বা তা নেই।

দহনের মূল রহস্য হলো ওই দাহিকা। কোন জিনিস যখন পুড়তে থাকে তখন ওই পদার্থের দাহিকা যার সেই দাহিকা নেই, তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাতাস হচ্ছে এমন একটা পদার্থ যার দাহিকা একেবারে নেই। যে জিনিসের বেশ খানিকটা ওই বাড়তি দাহিকা আছে সে মনের আনন্দে বাতাসে এসে পুড়তে থাকে।

এ ব্যাপারটা যেন তোমাদের পকেটে বাড়তি টাকা থাকার মতো—থাকলেই খরচ করতে ইচ্ছে করে।

দাহিকা ব্যাপারটা প্রচার হতেই দারুণ একটা হৈচৈ পড়ে গেলো সে-যুগে। দাহিকা কোন জিনিস ছেড়ে যাওয়ার পর যা পড়ে থাকে তা হলো সেই অ্যারিস্টটলের চারটে পদার্থের একটা, মাটি। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বললে মাটির মতো পদার্থে কিছু দাহিকা ঢুকিয়ে দিতে পারলেই কাজ শেষ—পাওয়া যায় চমৎক্যর কোন চকচকে ধাতু।

স্টল দারুণ মজার ব্যাপারই চালু করলেন। অ্যারিস্টটলের অনুগামীরা তো এইরকম একটা খড়কুটো ধরেই বাঁচতে চাইছিলো। তাদের ভাবটা দাঁড়ালো, যাক বাবা মুখরক্ষা হলো। পরমাণুর ব্যাপারে পাত্তা না পেলেও অ্যারিস্টটল ওই দাহিকায় নির্ভর করে আবার যেন জাঁকিয়ে বসলেন।

অ্যারিস্টটলের অনুগামীরা এবার বেশ সুবিধাবাদী কথাবার্তাই বলতে শুরু করলো।

কোন ধাতু যখন দাহিকা হারিয়ে একটু ভারি হয়ে দাঁড়ায়, যেমন লোহায় মরচে ধরলে, তখন তারা বলে ওঠে, 'ওসব ওজনের ব্যাপার নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না—জিনিসটাই আসল। ওজন-টজন—ফুঃ!' আবার সুযোগ মতো তারাই বলতে থাকে, 'আর বুঝলে না দাহিকার ওজন নেই, তাই জিনিসটা ওটা থাকলে হালকা মনে হয়।'

এসব কথাবার্তায় আসল ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো?

ব্যাপারটা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো যে প্রায় ষাট বছরের মতো পরমাণু তত্ত্ব রইলো একেবারে বাক্সবন্দী হয়ে। দাহিকার দাপটে পরমাণু একেবারে নট নড়নচড়ন হয়ে রইলো। দু হাজার বছরের ঘুম ভাঙার পর এই হলো তার পরিণতি। ভারি দুঃখেরই কথা।

ওই দাহিকা ব্যাপারটা মানুষকে যে কতখানি অসহায় আর যাদু করে ফেলেছিলো ভাবলেও অবাক হতে হয়। বড় বড় বিজ্ঞানীরাও এর মোহ কাটাতে পারেননি।

এই রকমই একজন বিজ্ঞানী ছিলেন ইংলণ্ডের যোশেফ প্রিস্টলে।

প্রিস্টলে নানা রকম গবেষণা করতেন। গ্যাস নিয়ে নানা রকম পরীক্ষাও তিনি করেছিলেন। এই রকম এক অজানা গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে ওই গ্যাসে মোমবাতি খুব তাড়াতাড়ি চমৎকার ভাবে জ্বলে—বাতাসে যে ভাবে জ্বলে তার চেয়ে ঢের বেশি।

গ্যাসটা কি ছিলো বুঝতে পারছো?

নিঃসন্দেহে অক্সিজেন গ্যাস। কিন্তু বেচারি প্রিস্টলে—তখন পর্যন্ত অজানা ওই অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেও ব্যাপারটার গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন ওই গ্যাসটার দাহিকা এত কম যে সে ওই মোমবাতির দাহিকা দখল করতে চাইছিলো।

শেষ পর্যন্ত তিনি আরও একটা হাস্যকর কথা বললেন।

তিনি বললেন গ্যাসটা দাহিকা হারানো বাতাস ছাড়া কিছু নয়। এত বড় আবিষ্কারটা বেচারির হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হলো।

শুধু কি প্রিস্টলে?

তাঁর আর অপরাধ কতটুকু। তাঁর চেয়েও ঢের বড় বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেনডিস। তিনিই ১৭৬৬ সালে আবিষ্কার করেন হাইড্রোজেন গ্যাস। হেনরি ক্যাভেনডিসও ওই দাহিকা ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে পারেননি। তিনি বললেন, এমন কি প্রমাণ করেও দেখালেন প্রিস্টলের ওই দাহিকা-বিহীন বাতাসের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কার করা গ্যাস মিশিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করলে জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু মজার কথা, তিনি ব্যাপারটা দাহিকার কোন কারসাজী বলেই ধরে নিলেন।

ভারি মজার মানুষ ছিলেন ক্যাভেনডিস। একাকী থাকতেই ভালবাসতেন। একা বসে পৃথিবীর ওজন তিনিই নিখুঁত ভাবে প্রথম বের করেন। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এমনই কম ছিলো যে তাঁর মৃত্যুর পর ছাড়া তাঁর বহু আবিষ্কারের কথাই মানুষ জানতে পারেনি।

কিন্তু এত বড় বিজ্ঞানী হয়েও দাহিকার মোহজাল কাটাতে পারেননি তিনি। একসময় তো তিনি ওই হাইড্রোজেনকেও একেবারে দাহিকা বলে বসেছিলেন। পরে অবশ্য সে মত তিনি পাল্টে নেন।

তাহলে দেখতে পাচ্ছো সে যুগটাই ছিলো ওই দাহিকার যাদুমন্ত্রে আটকে থাকা একটা যুগ। এ যেন সেই লক্ষ্মণের গণ্ডী, কারো এর বাইরে বেরুবার উপায় ছিলো না।

কিন্তু একটা কথা।

সত্যিই কি সে যুগের মানুষ বা বিজ্ঞানীরা এত ভুল করেছিলেন?

যদি ধরা যায় তাঁদের ওই দাহিকা ব্যাপারটা 'শক্তি' বা 'এনার্জি' ছাড়া কিছু নয়, তাহলে?

তাহলে তো অনেক রহস্যই আর রহস্য থাকে না।

আজকের অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীই এ কথা বলতে চাইছেন।

কিন্তু সে কথা যাক। আবার ফিরে যাই চলো দাহিকার যুগটায়।

পদার্থের সব সমস্যাটা যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিলো তখন। লাল বাতি দেখে গাড়ি যে ভাবে থমকে দাঁড়ায়, ঠিক যেন সেই ভাবে।

তখন কি দরকার ছিলো বলতে পারো?

দরকার ছিলো প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন মানুষ।

আর ঠিক সেই প্রয়োজনীয় সন্ধিক্ষণে দেবদূতের মতো এসে দাঁড়ালেন সেই ফরাসী বিজ্ঞানী, লাভোসিয়ে।

লাভোসিয়ের ছিলো সেই প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টি—সমস্যাকে বুঝে নেওয়ার মতো জ্ঞান আর বুদ্ধি। আরও একটা জিনিস ছিলো লাভোসিয়ের। যে জিনিসটার প্রয়োজনীয়তার কথা এর আগে কেউই ভাবেননি বা আমল দেননি।

সেই জিনিসটা হলো একটা সূক্ষ্ম দাঁড়িপাল্লা বা ব্যালান্স।

ওই দাঁড়িপাল্লা, অনুসন্ধিৎসু মন আর প্রখর যুক্তি তর্ক সম্বল করে সামনে এসে দাঁড়ালেন লাভোসিয়ে। গবেষণা আর বিশ্লেষণ করার গভীর আগ্রহের ফলে লাভোসিয়ে ওই দাহিকা ব্যাপারটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে নস্যাৎ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিলেন অ্যালকেমিস্ট বা অপরাসায়নিক-

দের কাজকর্মকে।

শুধু এইটুকুই নয়।

লাভোসিয়ে এ ছাড়াও সারা দুনিয়ার মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে বুঝতে সাহায্য করলেন পদার্থের গঠন আর বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া কি ভাবে ঘটে।

লাভোসিয়েরও আগে অনেকে কাঁচের পাত্রের মধ্যে বৃষ্টির জল ধরে পাতিত করে দেখেছিলেন বেশ একটু তলানি পড়ে থাকে।

কিন্তু ওই ব্যাপারটা কেনঘটে তার দারুণ একটা মজাদার ব্যাখ্যাই তাঁরা করতে চাইতেন।

এরও মূল সেই দাহিকা।

তাঁরা ব্যাখ্যা করতেন জল হলো দাহিকাবিহীন মাটি। অতএব জলকে গরম করার মধ্য দিয়ে দাহিকা যোগ করে জলকে মাটিতে (অর্থাৎ সেই তলানি) পরিবর্তিত করা চলতে পারে।

এবার লাভোসিয়ে ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে চাইলেন নিজে। তিনি খুব সাবধানে ওই বৃষ্টির জল আর কাঁচের পাত্র ওজন করলেন। এ ছাড়াও ওজন করলেন সেই তলানিটুকুও।

তিনি প্রমাণ করে দেখালেন ওই তলানি জমা হওয়ার দরুন কোনরকম জল নষ্ট হয় না। তবে ওই কাঁচের পাত্রের খানিকটা কাঁচের ক্ষয় হয় অবশ্য।

এতে কি প্রমাণ হলো বুঝতে পারছো?

ওই তলানি ওজন করার পর দেখা গেলো যে ওই তলানির ওজন ক্ষয়ে যাওয়া কাঁচের ওজনের একেবারে সমান সমান।

লাভোসিয়ে তার নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিলেন।

সব পরীক্ষার ব্যাপারেই তাঁর বিশ্বস্ত হাতিয়ার কি ছিলো সেটা আগেই বলেছি।

সেই নিখুঁত দাঁড়িপাল্লা।

লাভোসিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলেন পদার্থ কখনও সৃষ্টি বা বিনষ্ট করা যায় না—এই নিয়ম আজও অম্লান হয়েই আছে। লাভোসিয়ে বুঝিয়ে

দিলেন সব ব্যাপারটাই রাসায়নিক ক্রিয়া। তিনি পরিষ্কার ভাবেই বুঝিয়ে দিলেন যে পদার্থকে তার বিভিন্ন সরল মৌলিক অংশে ভেঙে না দিলে বা অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত করে নতুন পদার্থ সৃষ্টি না করলে তার ধর্ম বদলায় না। অর্থাৎ পদার্থের চরিত্র বদলের একমাত্র কারণ হলো রাসায়নিক ক্রিয়া—দাহিকা বস্তুটি নেহাত ধাপ্পা।

লাভোসিয়েই জানালেন মৌলিক আর যৌগিক পদার্থের তফাতটা কোথায়। মৌলিক পদার্থকে আর কোন অংশে ভেঙে ফেলা অসম্ভব কিন্তু যৌগিক পদার্থ ভাঙা সম্ভব।

লাভোসিয়ের আবিষ্কারে প্রতিপক্ষ একেবারে বেকুব—তাইতো, এ আবার কি হলো!

তাদের আর পায়ের তলায় দাঁড়াবার মতো মাটিটুকুও রইলো না।

আর সেই দাহিকার ভূত? তার কি হলো?

সে ভূতের দেশ ছেড়ে পালানো ছাড়া পথ রইলো না।

কিন্তু এরপর সেই মহাবিজ্ঞানী লাভোসিয়ের কি হলো?

সে এক অতি দুঃখেরই ইতিহাস।

লাভোসিয়ে যদি তাঁর জীবন নিয়ে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারতেন তাহলে নিঃসন্দেহে মানবসমাজ আরও অনেক নতুন জ্ঞানলাভ করতে পারতো।

কিন্তু হায়, ১৭৯৪ সালের ৫ই মে তারিখে এক জঘন্য ঘাতকের হাতে গিলোটিনের তলায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো অমূল্য সেই মাথাটি।

মানুষের মুক্তির যে স্বাদ বয়ে আনতে চেয়েছিলো ফরাসী বিপ্লব, সেই বিপ্লবের আগুনের এক শিখায় চিরদিনের মতো নিভে গেলো মহাজ্ঞানী মানুষটির জীবনপ্রদীপ। যিনি মানুষের জ্ঞানের মুক্তি আনার চেষ্টাতেই জীবনপাত করেছিলেন, আর এক মুক্তিই তাঁকে চিরকালের মতো আড়ালে নিয়ে গেলো।

এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা কি আর মানুষের ইতিহাসে আছে?

॥ তিন ॥

এক মাস্টারমশাই

এবার শুরু হতে চলেছে উনবিংশ শতাব্দী।

এ যেন এক নাটমঞ্চ। ধীরে ধীরে উঠলো যবনিকা। আবার অভিনীত হতে চলেছিলো পরমাণু নাটক।

ওই নাটক অভিনয়ের জন্য কি দরকার ছিলো ?

দরকার ছিলো খুব দক্ষ একজন অভিনেতা আর চমৎকার একখানা নাটকের পাণ্ডুলিপি।

দর্শকেরা যেন আকুল আগ্রহেই অপেক্ষা করছিলো। ধীরে ধীরে এবার মঞ্চে প্রবেশ করলেন নাকে চশমা আঁটা এক অঙ্ক আর বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই।

লোকটি কে ?

লোকটির নাম একবার তোমরা গোড়ার দিকেই শুনেছো।

তাঁর নাম জন ডালটন। তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেস্টার শহরের মানুষ।

অদ্ভুত ভাবুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ডালটন। বসে বসে খালি আকাশ-পাতাল ভাবতেন। বিয়ে-থা করেননি। সম্বলের মধ্যে ছিলো শুধু একখানা ছোট্ট ঘর আর একটা পোষা বেড়াল।

পরমাণুর প্রকৃতি আর পদার্থের পরস্পরের মধ্যের রাসায়নিক ক্রিয়া নিয়ে তিনি একেবারে আসর মাত করে ফেললেন। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ ওই সময় আর কেউই ছিলো না।

ডালটন যখন মঞ্চে ঢুকলেন তখন পরমাণু ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়েই দাঁড়িয়েছিলো।

এর আগেও অবশ্য লোকে এ ব্যাপারে অনেক অনেক কথাই বলতে

চেয়েছে, কিন্তু সবই কেমন গোলমেলেই থেকে গেছে। সহজ সোজা কথা কেউই তেমন বলতে পারেননি।

ডালটনই ব্যাপারটা সর্বপ্রথম সহজ সরল করে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে কারও মুখে আর কথা যোগালো না।

তাইতো, ব্যাপারটা কি এতই সহজ?

হ্যাঁ, ঠিকই তাই। আসলে কোন তত্ত্ব বোঝানোর মতো ক্ষমতা এর আগে কারও ছিলো না।

নাটকটা লাভোসিয়ের প্রস্থানের পর কেমন যেন একটু গোলমেলে আর জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় পরমাণুকে মেনে নিয়েও জট ছাড়াতে পারছিলো না কেউ।

এ সময় একটা বেশ মজার ব্যাপারও ঘটতে চাইলো।

একদল বললেন, লাভোসিয়ে বলেছেন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মৌলিক পদার্থ মিলেই যৌগিক পদার্থ তৈরি হয়।

বেশ কথা।

কিন্তু একথা তো কেউ বলেননি সেই মেলামেশার অনুপাত কেমন হবে। এটা তো সব জায়গায় সমান না থাকতেও পারে? মানে, তারা জায়গায় জায়গায় সময়ে সময়ে তো আলাদা রকমও হতে পারে?

এরকম একটা তর্কের ঝড় তুললেন একজন সমাজের বেশ উঁচুতলার মানুষ।

লোকটির নাম কাউন্ট ক্লড লুই বার্থোলেট।

বার্থোলেট একজন নামকরা রাসায়নিকও ছিলেন। একেবারে আনাড়ি নন। লাভোসিয়ের সঙ্গেও তিনি একসময় কাজও করেছিলেন। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের তিনি ছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ে পরামর্শদাতা। অতএব তাঁর ক্ষমতা নেহাত কম ছিলো না।

কিন্তু হলে হবে কি, বার্থোলেটের ধ্যান-ধারণা বেশ একটু গোলমেলেই ছিলো।

তিনি ভেবেছিলেন মৌলিক পদার্থ যেমন খুশি অনুপাতে পরস্পর মিলিত হয়।

ধাঁধা তাতে কাটেনি। ডালটনই পরম যত্নে পরমাণুকে ঘষে-মেজে একেবারে চকচকে ঝকঝকে করে তুললেন। ১৮০৮ সালে ডালটন প্রকাশ করলেন তাঁর পরমাণুতত্ত্ব বা অ্যাটমিক থিয়োরি।

ডালটনের বক্তব্য এত সহজ সরল আর যুক্তি মেশানো যে বুঝে নিতে কোন রকম অসুবিধাই হয় না।

ডালটন একে একে যা বুঝিয়ে দিলেন তা হলো :

সমস্ত পদার্থই পরমাণুতে তৈরি।

পরমাণু হচ্ছে পদার্থের শেষ কথা। পরমাণু যেন ইঁট—ওই ইঁটেই সব পদার্থ গড়ে উঠেছে। একে আর ভেঙে ছোট করা যায় না।

প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর আকৃতি, গঠন আর ওজন এক আর তার মধ্যেই নিহিত মৌলিক ওই পদার্থের বিশেষ গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য।

এক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে অন্য আর একটা মৌলিক পদার্থের পরমাণুর অনেক তফাত। আর এই তফাতটুকুর জন্যেই মৌলিক পদার্থের গুণাগুণের তফাত।

রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পরমাণুর মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন হয় না। যা কিছু পরিবর্তন হয় তা হলো এদের অবস্থান আর মেলামেশার মধ্যে।

এবার ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ালো ?

দাঁড়ালো এই যে ডালটন সমস্ত রহস্যই পরিষ্কার করে দিলেন। সন্দেহের কণামাত্র স্থান রইলো না।

ব্যাপারটা কেউ অস্বীকার বা অগ্রাহ্যও করতে পারলো না। বিজ্ঞান জগৎ ডালটনের তত্ত্বই গ্রহণ করে নিলো। এ রকম একটা ব্যাখ্যাই বুঝি সকলে চাইছিলো এতকাল ধরে।

ডালটন যেন যাদুকরের মতো যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে একটা চমৎকার কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়লেন। বিজ্ঞান যেন ধাঁ করে কয়েক শো ধাপ এগিয়ে গেলো।

ডালটন আরও কয়েক ধাপ এগোলেন। নিজের আবিষ্কারের আলোয় এবার তিনি লাভোসিয়ের পরীক্ষাটা যাচাই করে নিতে চাইলেন। লাভো-সিয়ের সেই ক্ষুদ্র অংশের মতো তাঁরও সেই পরমাণু জুড়ে রাসায়নিক ক্রিয়া

কি অদ্ভুত তাঁর ধারণাটা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।

তিনি বললেন মিশরের নীল নদের জলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের সংমিশ্রণের অনুপাত তাঁর জন্মভূমি ফ্রান্সের সীন নদীর মতো একই রকম না হতেও পারে।

তাজ্জব কাণ্ডই বটে!

তবে বার্থোলেটের ওই রকম উদ্ভট কথাবার্তা শুনেই তাঁকে একহাত নিলেন তাঁরই স্বদেশবাসী আর এক বিজ্ঞানী, যোশেফ লুই প্রাউস্ট।

প্রাউস্ট সোজাসুজি পঞ্জা কষতেই এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন বার্থোলেটের বক্তব্য একেবারে গ্রহণের অযোগ্য, অর্থহীন। প্রাউস্ট বললেন যে, জল হচ্ছে জল—তা সে জল দুনিয়ার যে কোন জায়গা থেকেই যোগাড় করা হোক না কেন।

লড়াইটা বেশ জমে উঠলো এবার।

দুজনেরই প্রচুর ক্ষমতা আর নাম ডাক। অতএব মাঝখান থেকে সমস্ত ব্যাপারটাই একেবারে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় ঝুলে রইলো। দুই বিজ্ঞানী বেশ চোখা-চোখা তীর ছুঁড়ে চললেন পরস্পরের দিকে।

কিন্তু মূল সমস্যাটার হাল কি হলো?

মূল সমস্যা সমাধান করতে হাত লাগালেন শেষ পর্যন্ত সেই ইংরেজ মাস্টারমশাই, জন ডালটন। শান্তভাবে, যুক্তি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করে দিলেন তিনি।

ডালটনের হাতিয়ার কি ছিলো ওই ব্যাখ্যার ব্যাপারে জানো?

সেই পরমাণু!

এতদিন যেন মানুষ পরমাণুর কথাটা প্রায় ভুলতে বসেছিলো।

ডালটনই পরমাণুকে আবার মঞ্চে টেনে আনলেন।

পরমাণুকে কাজে লাগিয়ে ধাপে ধাপে ডালটন লাভোসিয়ের রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যাপারটা একেবারে জলের মতোই পরিষ্কার করে দিলেন।

তাঁর ওই কাজই রাসায়নিক চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিলো বলতে পারা যায়।

ডালটনের আগেও অনেকে পরমাণু সম্পর্কে নানা কথা বলেছিলেন। কিন্তু

ঘটে থাকে—এ কথাই বললেন ডালটন।

অতএব এক পদার্থের পরমাণু সংখ্যাকে নিশ্চয়ই অন্য পদার্থের পরমাণু সংখ্যা আকর্ষণ করে—আর সেই সংখ্যাটি অবশ্যই বিশেষ কোন যৌগিক পদার্থের ব্যাপারে একেবারে নির্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ এ হলো ধ্রুবক, এর কোন রকম পরিবর্তন হয় না। অন্য ভাবে বললে এটা দাঁড়ায় এই রকম: যখন কোন এক মৌলিক পদার্থ অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলে একটা যৌগিক পদার্থ তৈরি করে তখন একটির পরমাণু সংখ্যা অপরটির পরমাণু সংখ্যার একটি নির্দিষ্ট অনুপাতেই মিশে থাকে।

ওই নিয়মের নাম হলো দি ল অব কনস্ট্যান্ট প্রোপোরশান বা ধ্রুবক অনুপাতের নিয়ম।

আরও এগোলেন ডালটন।

তিনি বললেন যে কোন একটা মৌলিক পদার্থের পরমাণু অন্য আর একটা মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে একের চেয়ে বেশি অনুপাতেও মিশ্রিত হতে পারে। অর্থাৎ একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে মিশে একের চেয়ে বেশি যৌগিক পদার্থ তৈরি করতে পারে।

তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ালো?

দাঁড়ালো এই যে, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন একটা অনুপাতে মিশে জল তৈরি করতে পারে আবার, ওই দুটি গ্যাসের পরমাণুই অন্য অনুপাতে মিলে তৈরি করে হাইড্রোজেন পারক্সাইড নামে আর এক পদার্থ।

তবে একটা ব্যাপার কিন্তু লক্ষ্য করার মতো।

এ ধরনের অনুপাত ঘটলে কিন্তু ওই সূক্ষ্মকণাদের অর্থাৎ পরমাণুদের মধ্যে ১ : ১, ১ : ২, ১ : ৩, ১ : ৪ ইত্যাদি এই রকম সরল অনুপাতেই ঘটবে।

ডালটন বোঝালেন মৌলিক পদার্থ ক, মৌলিক পদার্থ খ-এর ১, ২, ৩ ইত্যাদি পরমাণুর সঙ্গে মিশে ক আর খ-এর $কখ_{১}$, $কখ_{২}$, $কখ_{৩}$ ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ তৈরি করতে পারে।

ডালটনের এই নিয়মের নাম হলো দি ল অব মালটিপল প্রোপোরশান

বা গুণিতক অনুপাতের নিয়ম।

তবে এখানে একটা কথা জানা দরকার।

কথাটা হলো ডালটনের নিয়ম যাচাই করার সময় রাসায়নিকরা ব্যবহার করেছিলেন অজৈব পদার্থ।

রাসায়নিকরা যদি জৈব পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করতেন তাহলে ভারি একটা গোলমেলে ব্যাপারই লক্ষ্য করতেন। কারণ জৈব পদার্থের বেলায় সেটা ঘটতো অঙ্গার বা কার্বনের জন্য।

কিন্তু তাহলে কি হতে পারতো ?

হতো এই, যে বিরাট একটা সন্দেহের সৃষ্টি হতো। তাহলে পরমাণু চর্চাই দারুণ ভাবে পিছিয়ে পড়তো।

পরে অবশ্য ব্যাপারটার ফয়সালা হয়। তখন বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরে গেছেন জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে ওই রকম বিদঘুটে ব্যাপার কেন ঘটে।

তাহলে এবার মোটামুটি ব্যাপারটা দাঁড়ালো কোথায় ? মানুষ কি পরমাণু সম্পর্কে একেবারে খুব অভিজ্ঞ হয়ে উঠলো ?

না, তা হলো না।

পরের পরিচ্ছেদেই এর কারণ দেখা যাবে।

॥ চার ॥
এবার অণু

পরমাণু তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার মধ্যে বেশ একটা ওঠা-নামা বা এগোনো-পেছোনোর ব্যাপার চলেছিলো। ডালটনের পরমাণু তত্ত্ব মানুষকে বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেলেও আবার পঞ্চাশটা বছর কেটে যাওয়ার আগে খুব আশাপ্রদ উন্নতি কিছু ঘটলো না।

কিন্তু এরকম অবস্থা হলো কেন ?

ভারি মজার কথা, এর জন্যে ওই মাস্টারমশাই জন ডালটনই কিন্তু

বেশ খানিকটা দায়ী।

এই সময় পরমাণুতত্ত্ব চর্চা বেশ একটু বাধার সামনে পড়ে গেলো।

পরমাণু আবিষ্কার হওয়ার পর তাকে মানুষ মেনে নিলেও, পদার্থের ওই ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুকে ছেড়ে আরও বড় কিছুর দিকে নজর দেওয়ার সময় এসে গেলো।

পরমাণুর চেয়ে বড় জিনিসটা কি রকম ?

সেই বড় জিনিসটার নাম হলো অণু। ইংরাজীতে এর নাম মলিকিউল।

ডালটন ভালবেসেছিলেন পরমাণুকে। পরমাণুই ছিলো তাঁর ধ্যান জ্ঞান সবকিছু। এর বাইরেও কিছু থাকা সম্ভব আদৌ ভাবেননি ডালটন।

বেচারি ডালটন। তিনি পরমাণু সম্পর্কে এমনই দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন যে পরমাণুর চেয়ে বড় জিনিস অর্থাৎ ওই অণু তাঁর নজরেই পড়েনি।

কিন্তু তা আসলে নয়। ডালটনের নজরে পড়েছিলো ঠিকই।

ডালটনের নজরে পড়লেও ওই অণুকে তিনি মনে করেছিলেন যৌগিক পদার্থের পরমাণু। এ রকম একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়ায় ডালটন নিজে আর সমস্ত বিজ্ঞান জগৎটাই বেশ ধাঁধায় পড়ে গেলো।

ডালটন কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিকই বুঝেছিলেন। সেটা হলো রসায়নকে শক্ত মাটির ওপর দাঁড় করানো দরকার।

এর জন্যে তিনি স্বাভাবিকভাবেই কিছু করেছিলেন।

তিনি কি করেছিলেন সেটাই এবার দেখা যাক।

রসায়নকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য তাঁর মতে প্রয়োজন ছিলো মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় তাদের পরমাণুকে একটা শুদ্ধ সংখ্যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দরকার।

ডালটন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পরমাণুর একটা ওজন আছে। তাদের সেই ওজনটাই জেনে নেওয়া একান্ত জরুরী কাজ। রসায়নের উন্নতির জন্যেই তার প্রয়োজন।

কিন্তু কাজটা যত সহজে বলা যায় তত সহজে করা যায় কি ?

ডালটন ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত একটা পথ আর পদ্ধতি তিনি আবিষ্কারও করে ফেললেন।

এ কাজটা তো সহজেই কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে একক ধরে নিয়ে করা সম্ভব।

এরকম ভেবে নিয়েই কাজে নামলেন ডালটন। হাইড্রোজেন গ্যাসই মানুষের জানা সবচেয়ে হালকা গ্যাস বলে ডালটন ওই হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুকে দিলেন পারমাণবিক ওজন 'এক'।

ব্যাস, এবার ওই হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন একের সঙ্গে তুলনা করে অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুকে একক ধরে নিয়ে অন্যান্য পদার্থের পরমাণুর ওজন জেনে নেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন জন ডালটন।

এটা কিভাবে প্রমাণ করলেন তিনি?

দেখা যাক।

ডালটন দেখতে পেলেন দশ গ্রাম ওজনের হাইড্রোজেন গ্যাস ৩৫৫ গ্রাম ওজনের ক্লোরিন গ্যাসের সঙ্গে মিশে একটা যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে এবং তিনি যেহেতু জানতেন একটা হাইড্রোজেন পরমাণু একটাই ক্লোরিনের পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে তো সহজেই বলা যায় ক্লোরিনের পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় ৩৫·৫ গুণ বেশি ভারি।

কেমন সহজ ব্যাপার একটু ভেবে নাও।

অর্থাৎ অনায়াসেই তাহলে বলা যায় ক্লোরিনের পারমাণবিক ওজন ৩৫·৫।

এতদূর পর্যন্ত বেশ ভালই চলেছিলো। কিন্তু এবার ডালটনের পরমাণু আর অণু সম্পর্কে ভুল ধারণাটাই গোলমাল বাধালো।

ডালটন ধরে নিয়েছিলেন প্রতিটি পদার্থের মধ্যেই অসংখ্য স্বাধীন পরমাণু বাসা বেঁধে আছে। আর কোন দুটি মৌলিক পদার্থ মিলে একটা যৌগিক পদার্থ তৈরি করলেই সেই যৌগিক পদার্থে অন্ততপক্ষে প্রতিটি মৌলিক পদার্থের এক-একটি পরমাণু থাকতেই হবে।

ডালটন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেলো তিনি ভারি গোলমেলে সব সংখ্যাই যোগাড় করেছেন।

যেমন ধরা যাক জল।

ডালটন জলের গঠন নিয়ে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করলেন যেহেতু ৮ ভাগ অক্সিজেন ১ ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলেই ৯ ভাগ জল উৎপন্ন করে,

মৌলিক পদার্থ	ডালটনের প্রতীক চিহ্ন	বারজিলিয়াসের প্রতীক চিহ্ন
অক্সিজেন (OXYGEN)	○	O
নাইট্রোজেন (NITROGEN)	⦶	N
হাইড্রোজেন (HYDROGEN)	⊙	H

ডালটন ও বারজিলিয়াসের প্রতীক চিহ্ন

অতএব জলের রাসায়নিক সূত্র হলো HO আর অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন হলো ৮।

এখনকার দিনে তো ব্যাপারটা স্কুলের ছেলেদের কাছেও দারুণ মজার ব্যাপার বলেই মনে হতে চাইবে। এর কারণ আজকালকার স্কুলের ছাত্ররাও জানে যে জলের রাসায়নিক সূত্র হলো H_2O—অর্থাৎ অক্সিজেনের একটা পরমাণু হাইড্রোজেনের দুটো পরমাণুর সঙ্গে মিলেই জল তৈরি হয়।

তাহলে রহস্যটা কিরকম দাঁড়ালো ?

রহস্যটা দাঁড়ালো এই যে এতে বোঝা গেলো অক্সিজেনের ৮ ভাগের সঙ্গে হাইড্রোজেনের ১ ভাগ মেলার অর্থ হলো যে অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দুটো পরমাণুর চেয়ে ৮ গুণ বেশি ভারি।

অর্থাৎ অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন হবে ১৬।

এরকম ভুল ডালটন আরো করেছিলেন। অ্যামোনিয়া গ্যাসের সূত্র তিনি লিখলেন NH। অর্থাৎ একটা নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর মিশেল।

কিন্তু আজকের ছেলেরাও জানে অ্যামোনিয়ার সূত্র হলো NH_3।

কিন্তু ডালটনকে দোষারোপ করে লাভ নেই।

আসল কথা হলো ওই রহস্য ভেদ করার জন্য একজন যোগ্য মানুষেরই দরকার ছিলো।

ঠিক সময়মতো একজন ওই রকম মানুষও এসে হাজির হলেন।

তিনি একজন ফরাসী। নাম যোশেফ লুই গে-লুসাক। ডালটনের পরমাণু-তত্ত্ব প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই তিনি রহস্যভেদ করলেন।

গে-লুসাক যে পরীক্ষা করেছিলেন তা তিনি করেছিলেন গ্যাস নিয়েই। ১৮০৯ সালে গে-লুসাক বললেন গ্যাসের সঙ্গে গ্যাস মিলিত হওয়ার মধ্যে বেশ একটা মজার ব্যাপার ঘটে। আর সেটা ঘটে আয়তনের একটা সরল সংখ্যার অনুপাতে নির্ভর করেই। অর্থাৎ গ্যাস মিলিত হয় আয়তনের সঙ্গে আয়তন অনুযায়ী।

গে-লুসাকের নিয়ম বিশেষ করে গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিলো। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলেন গ্যাসের রাসায়নিক প্রক্রিয়া

পরস্পরের মধ্যে আয়তনেই নির্ভরশীল। আর সেটা হয় একটা সরল অনু-পাতে : ১, ১½, ২, এইভাবে।

ডালটন কিন্তু গে-লুসাকের তত্ত্ব মেনে নিতে পারলেন না।

আবার সেই ব্যাপার ঘটলো। ডালটন পদার্থের আণবিক অবস্থাটা বুঝতে পারলেন না।

আর দুঃখের কথা এতেই তাঁর পতন হলো।

এবার ডালটনের বক্তব্য একটু তলিয়ে দেখা যাক।

নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনের মিশেলে তৈরি নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রাস গ্যাসের ব্যাপারটা দেখাতে চাইলেন ডালটন।

ডালটন দেখালেন নাইট্রোজেনের এক আয়তন অক্সিজেনের এক আয়তনের সঙ্গে মিলে নাইট্রাস গ্যাস তৈরি হয়। এক্ষেত্রে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের পারমাণবিক ওজনের অনুপাত ধরে নেওয়া হলো ১ : ১।

ডালটন বললেন গে-লুসাকের কথা মেনে নিলে এতে তৈরি হয় এক আয়তন নাইট্রিক অক্সাইড। অর্থাৎ নাইট্রিক অক্সাইডের পরমাণু সংখ্যা নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যার অর্ধেক। অর্থাৎ তাহলে নাইট্রিক অক্সাইডের আয়তন হতে হবে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলিত আয়তনের অর্ধেক। এর সমান নয়। যেহেতু ব্যাপারটা তা হয় না—তাহলে গে-লুসাকের তত্ত্বই ভুল।

কিন্তু আসলে ভুলটা কিন্তু অনেকখানিই ডালটনের। সঠিক একটা কথার জন্যই বিজ্ঞান-জগৎটাই যেন ডালটনের হাতছাড়া হয়ে গেলো।

কথাটা কি?

আগেই বলা হয়েছে সেই বিশেষ কথাটা হলো অণু।

ডালটন পরীক্ষায় যা দেখেছিলেন তা হলো ওই অণু। কিন্তু সেটা না বুঝে তিনি তাকে পরমাণু বলেই মনে করেছিলেন।

কিন্তু তাহলে ব্যাপারটা কোথায় এসে দাঁড়ালো? বিজ্ঞান কি ওই অবস্থাতেই থেমে থাকবে?

না, তা নয়।

একজন বিজ্ঞানী সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাপারটা দেখে আলো জ্বেলে

ক্ষণিক ওই অন্ধকার দূর করতে সাহায্য করলেন।

তিনি একজন ইতালীয় অধ্যাপক আমেদিও অ্যাভোগ্যাড্রো।

ডালটনের চোখে যা পড়েনি সেই সহজ সরল ব্যাপারটা ধরা পড়লো অ্যাভোগ্যাড্রোর চোখে।

অ্যাভোগ্যাড্রো বললেন মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ পারমাণবিক অবস্থায় থাকে না, থাকে আণবিক অবস্থায়।

অর্থাৎ গ্যাসের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু নয়, তা হলো অণু!

অণু আর পরমাণুর মধ্যের তফাতটা অ্যাভোগ্যাড্রোই প্রথম দুনিয়াকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

অ্যাভোগ্যাড্রো বললেন যে কোন গ্যাস কোন পরমাণুতে তৈরি নয় বরং নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক ওই পরমাণুই সংযুক্ত অবস্থায় অণু হিসাবেই থাকে।

কোন মৌলিক পদার্থের বেলায় পরমাণু যেমন ওই পদার্থের গুণাগুণ বজায় রাখে গ্যাসের বেলাতেও তেমনি ওই অণু সেই গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

অ্যাভোগ্যাড্রো এবার ডালটন আর গে-লুসাকের তত্ত্ব এক জায়গায় জড়ো করে নিজের আণবিক তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। অ্যাভোগ্যাড্রো বেশ সহজ ভাবেই সব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন।

তিনি বললেন:

ডালটন ঠিক বলেছেন যে পরমাণুরা একটা সরল সংখ্যার অনুপাতেই মিলিত হয়।

গে-লুসাকও ঠিক বলেছেন যে গ্যাসেরা যখন মিলিত হয় তখন তারা মেলে আয়তনের সঙ্গে আয়তনের অনুপাত অনুযায়ী।

এবার নিজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন অ্যাভোগ্যাড্রো:

আমার কথাও ঠিক যে সম আয়তনের গ্যাস সম আয়তনের গ্যাসের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে তা হয় ছোট ছোট সম সংখ্যার সূক্ষ্ম কণা মিলিত হয়েই। আর ওই সূক্ষ্ম কণা হলো অণু। যে অণু তৈরি হয় দুই বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যার পরমাণু যুক্ত হয়ে।

নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অ্যাভোগ্যাড্রো সিদ্ধান্ত করলেন যে তখনকার

মৌলিক গ্যাসে যে অণু ছিলো তারা তুটো করে পরমাণু যুক্ত।

এবার তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ালো ভাবো একটু।

ব্যাপারটা দাঁড়ালো এমন একটা জায়গায় যখন মোটামুটি কিছু অর্থ বোধগম্য হতে চললো। যে নাইট্রাস গ্যাসের রহস্য ডালটনকে ফাঁদে ফেলেছিলো সেই ব্যাপারটাই ধরা যাক। এটা ছিলো এই রকম ঃ

নাইট্রোজেনের প্রতিটি অণু N_2 আর অক্সিজেনের প্রতিটি অণু O_2 অবশ্যই রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় তুটি পরমাণুতে ভাগ হয়ে যায়, যেহেতু মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া পরমাণুর ওপর নির্ভর করেই হয়।

তাহলে নাইট্রোজেনের তুটো পরমাণু নিশ্চয়ই অক্সিজেনের তুটো পরমাণুর যে কোন একটির সঙ্গে মিলিত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইডের এক অণু তৈরি করে।

অ্যাভোগ্যাড্রো এইটুকুই দেখাতে চাইলেন।

তাহলে দেখা গেলো অ্যাভোগ্যাড্রোর তত্ত্ব তুনিয়ার বিজ্ঞানীদের সামনে এক নতুন দিগন্তের দরজাই যেন খুলে ধরলো। এখন আর আন্দাজে কিছু করার দরকার ছিলো না।

অতএব দেখা গেলো জলের সূত্র ডালটনের মত অনুযায়ী HO নয়। অ্যাভোগ্যাড্রোর তত্ত্ব অনুযায়ী প্রমাণ হলো যে হাইড্রোজেনের তুটো অণু অক্সিজেনের এক অণুর সঙ্গে মিলিত হয়েই তুই অণু জল উৎপন্ন করে। এটাও জানা গেলো অক্সিজেনের একটা অণুতে তুটো পরমাণুই আছে। অর্থাৎ জলের সূত্র হলো H_2O।

ব্যাপারটা এবার বুঝেছো ?

এবার পরমাণু সম্বন্ধে আমরা খুবই অভিজ্ঞ হয়ে উঠলাম। পরমাণু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অনেক অনেক দূর এগিয়ে গেলো।

এ যেন আলিবাবার সেই রত্নগুহার দরজা খুলে যাওয়া।

কিন্তু···।

হ্যাঁ, এখনও সেই সন্দেহের ছোঁয়া। মানুষের মন বড় বিচিত্র জায়গা।

মানুষ তখনও ওই ডালটনের পরমাণু তত্ত্বকেই নির্ভর করতে চাইছিলো। অ্যাভোগ্যাড্রোর অণু নিয়ে তারা তেমন মাথা ঘামাতে উৎসুক হয়ে ওঠেনি।

এর ফল দাঁড়ালো কি রকম ?

ফল হলো এই পরমাণু বিজ্ঞান আবার বেশ কিছু বছরের জন্য ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে ঝুলে রইলো।

কিন্তু প্রয়োজনের সময় ঠিক উপযুক্ত মানুষটির দেখা মেলে। মানুষের ইতিহাসই সে কথা বলে। তাই এবার উদয় হলেন একজন নামকরা গবেষক-বিজ্ঞানী। তিনি আসলে খুব বিখ্যাত একজন রসায়নবিদ্। জন্ম সুইডেনে। নাম জ্যাকব বারজিলিয়াস। ১৮১৮ সালে চল্লিশ বছরেরও কম বয়সে তিনি নানা রাসায়নিক পরীক্ষা করে দারুণ সুনাম কিনেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পরমাণু বিজ্ঞানকে বারজিলিয়াস আশাতীত এগিয়ে নিয়ে এলেন। তিনি এমন একটা জিনিস স্থির করলেন যা আগেকার বহু ধ্যান-ধারণাই বদলে দিতে চাইলো।

তিনিই প্রথম ডালটনের মতানুযায়ী সেই হাইড্রোজেনকে বাদ দিয়ে অক্সিজেনকে পরমাণুর ওজন বের করার মাপকাঠি করে নিলেন।

ব্যাপারটা সত্যিই দারুণ এক আবিষ্কার।

কারণ বহু মৌলিক পদার্থই হাইড্রোজেনের চেয়ে অক্সিজেনের সঙ্গেই বেশি মিলিত হতে চায়।

শুধু এইটুকুই আবিষ্কার করলেন বারজিলিয়াস ? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

না, তা নয়।

যদি অন্য কোন কিছু বারজিলিয়াস নাও করতেন শুধু একটা আবিষ্কার তিনি যা করেছিলেন তার জন্যেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

সে ব্যাপারটা কি জানো ?

সে ব্যাপারটা হলো, বারজিলিয়াসের সময় রাসায়নিকরা মৌলিক পদার্থ বোঝানোর জন্য বিদঘুটে সব চিহ্ন আর প্রতীক ব্যবহার করতেন ; ওই ব্যাপারটা চালু ছিলো সেই অ্যালকেমিস্ট বা অপরাসায়নিকদের আমল থেকে ; তাদের সেই ভূত তো তখনও সকলের ঘাড় থেকে পুরোপুরি নামেনি। তিনি সেই পদ্ধতি বদল করেন।

স্বয়ং ডালটনও ওই রকম বিচিত্র চিহ্ন ব্যবহার করতেন।

বারজিলিয়াস এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিলেন। তারপর

ভাবতে ভাবতেই চমৎকার একটা উপায়ও বের করে ফেললেন।

অক্সিজেনের তিনি নাম দিলেন O, হাইড্রোজেনের H, নাইট্রোজেন N এই রকম। জলের সূত্র দাঁড়ালো এইভাবে H_2O। অন্যান্য পদার্থগুলিরও একইভাবে NaCl, H_2SO_4 ইত্যাদি।

যুক্তিসম্মত ভাবেই বারজিলিয়াস শর্টহ্যাণ্ড লেখার মতো মৌলিক পদার্থ-গুলোর নামের আদ্যক্ষরকেই বেছে নিলেন।

এ যেন মানুষের ডাক-নাম ধরে ডাকা।

বিজ্ঞান জগৎ স্বাভাবিক ভাবেই কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো বারজিলিয়াসের কাছে। কারণ এবার থেকে কত সহজেই পদার্থদের পরিচিত করার কাজ এগিয়ে চলতে লাগলো। বারজিলিয়াসের আবিষ্কার একটা বৈপ্লবিক সূচনাই করে বসতে চাইলো।

কিন্তু এতে পরমাণু তত্ত্ব কোথায় এসে থামলো ?

পরের পরিচ্ছেদেই সেটা দেখি, এসো।

॥ পাঁচ ॥
পারমাণবিক ওজন

বিজ্ঞানীদের সামনে কিন্তু একটা সমস্যা থেকেই গেলো।

সেটা কি ?

সেটা হলো, বিশেষ করে রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা নিদারুণ অভাব। তাই বিজ্ঞানীরা একটা কথাই ভাবলেন মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে আরও তথ্য চাই। কিন্তু তথ্য সহজে মিলছে কই ?

এ সময় ইতালীর জেনোয়া শহরের একজন রাসায়নিক ১৮৫৪ সালে আবার সেই অ্যাভোগ্যাড্রোর বক্তব্যকেই নতুন করে বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরলেন। ওই রাসায়নিকের নাম স্ট্যানিশ্লাও ক্যানিজারো। অ্যাভোগ্যাড্রো পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে যে কথা বলতে চেয়েছিলেন সে কথাই

নতুন ভাবে আবার বলতে চাইলেন ক্যানিজারো।

সে কথাটা কি?

সেটা হলো :

একই তাপ আর চাপে একই আয়তনের গ্যাসীয় পদার্থে একই সংখ্যক অণু থাকে। আর গ্যাসেরা মিশ্রিত হলে সে মিশ্রণ হয় আয়তনের পরিমাপের অনুপাতে। আর কোন গ্যাসের অণুর ওজন অন্য গ্যাসের তুলনায় ওই গ্যাসের ওজনের সমানুপাতিক।

শেষের ওই ব্যাপারটা নেহাতই জরুরী।

কি ভাবে?

এ জন্য ডজন ডজন রাসায়নিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করার দরকার নেই। দরকার শুধু মৌলিক পদার্থটির গ্যাসীয় অবস্থা। তারপর তাকে নির্দিষ্ট চাপ আর তাপে ওজন করে নেওয়া—তারপর তার আণবিক ওজন বের করা।

এবার রাসায়নিকদের সামনে আর সমস্যাই রইলো না হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl না, $H_2\ Cl_2$ এটা জানতে।

দুটো মৌলিক পদার্থের মিশ্রণের ওজনটুকু জানতে পারলেই আর সমস্যা থাকে না।

ব্যাপারটা কি রকম এবার দেখা যাক।

এক আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস আর সম আয়তনের ক্লোরিন আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস ওজন করে দেখা যায় তাদের আণবিক ওজনের সমানুপাত ২ : ৭০ : ৩৬·৫।

এতে কি বোঝা গেলো?

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের অণু (যার ওজন ৩৬·৫) নিশ্চয়ই হাইড্রোজেনের আধখানা অণু (যার ওজন ১) আর ক্লোরিনের আধখানা অণুর (যার ওজন ৩৫·৫) সঙ্গে মিলেই তৈরি—অর্থাৎ হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর সঙ্গে ক্লোরিনের একটি পরমাণু মিলেই তৈরি হলো HCl অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলতে পারা যায় অ-গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজন খুব সহজেই এদের গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ পরীক্ষা করেই বলা সম্ভব।

যারা অ্যাভোগ্যাড্রোর কথায় তেমন কান দেয়নি তারাই কিন্তু এবারে ক্যানিজারোর কথা লুফে নিতে চাইলো।

কিন্তু একটা রহস্য।

মানুষ কেন অ্যাভোগ্যাড্রোর কথায় তেমন কান না দিয়ে ক্যানিজারোর কথা শুনতে চাইলো?

এর একটা কারণ ছিলো বৈকি।

ব্যাপারটা কিছুটা মনস্তাত্ত্বিকই বলা যায়। অ্যাভোগ্যাড্রো যেখানে হাইড্রোজেনের একটা অণুকে একক ধরেছিলেন ক্যানিজারো সেখানে ধরেছিলেন তার আধখানা অণুকে—অর্থাৎ এক পরমাণুকে।

এই একটা ব্যাপারেই রাসায়নিকদের মনে অণু আর পরমাণুর তফাতটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেলো।

এতেই বোঝা গেলো যে বেশির ভাগ গ্যাসীয় পদার্থের অণুতেই দুটো করে পরমাণু আছে—তবে ওই আধখানা অণুই অর্থাৎ পরমাণুই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

এই একটা ব্যাপার যে মুহূর্তে বোঝা গেলো। ঠিক তখনই গ্যাসের প্রক্রিয়ার ব্যাপারটাও সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। ডালটনের মতো এবার আর কাউকে ধাঁধায় পড়তে হলো না। কারণ নাইট্রোজেনের এক আয়তন অক্সিজেনের এক আয়তনের সঙ্গে মিলেই দু আয়তন-বিশিষ্ট নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রাস গ্যাস তৈরি হয়।

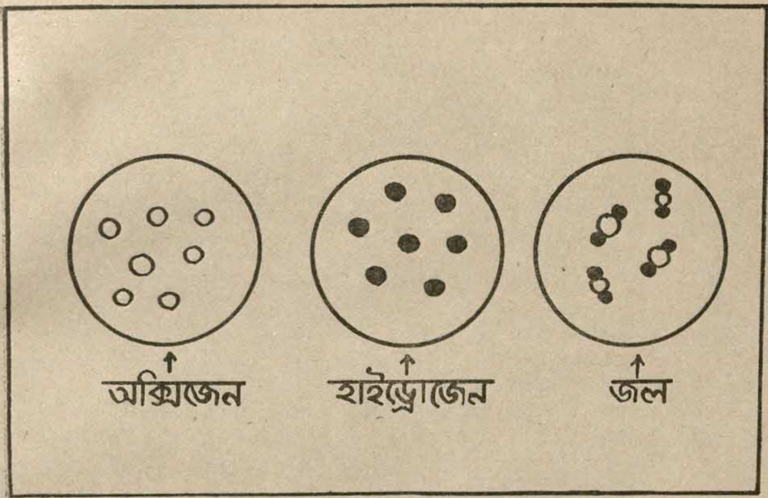
লোথার মেয়ার নামে এক রাসায়নিকও ক্যানিজারোর বক্তব্যকে আরও জোরালো ভাবে তুলে ধরলেন।

তাহলে এবার আর সমস্যাটা রইলো কোথায়?

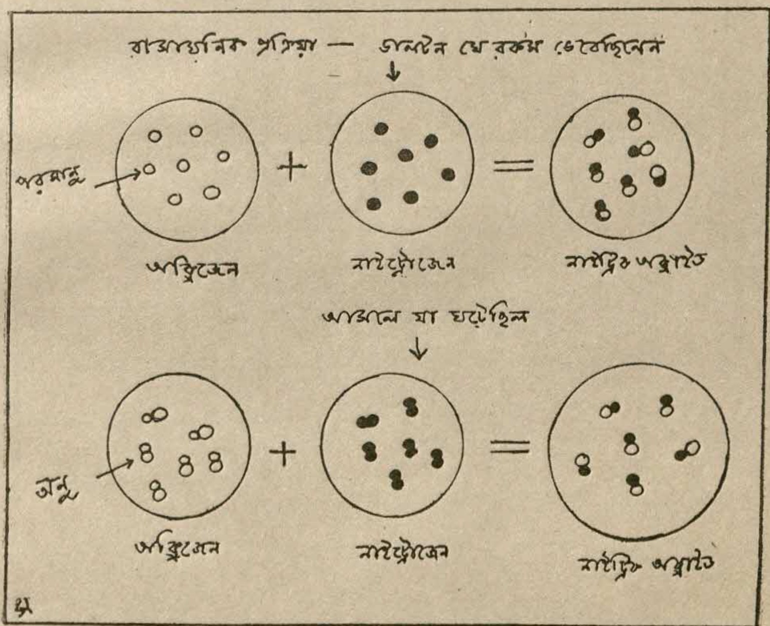
হ্যাঁ, সমস্যা একটা ছিলো।

সে সমস্যা হলো, যে সব মৌলিক পদার্থকে গ্যাসীয় অবস্থায় আনা যায় না তাদের ক্ষেত্রে কি হবে?

আবার যেন বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ আটকে গেলো। একটা বাধা এসে দাঁড়ালো। কিন্তু ওই উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই এর সমাধানও হয়ে গেলো।



জলের রাসায়নিক গঠন



নাইট্রিক অক্সাইডের গঠন

Periods	Series	Group I (a b)	II (a b)	III (a b)	IV (a b)	V (a b)	VI (a b)	VII (a b)	VIII	0
1	1	H 1 1								He 2 4.0
2	2	Li 3 6.9	Be 4 9	B 5 10.8	C 6 12.01	N 7 14	O 8 16.0	F 9 19		Ne 10 20.18
3	3	Na 11 22	Mg 12 24.3	Al 13 26.9	Si 14 28	P 15 30	S 16 32	Cl 17 35.2		A 18 39.9
4	4	K 19 39	Ca 20 40.2	Sc 21 44.9	Ti 22 47.09	V 23 50.95	Cr 24 52.01	Mn 25 54.93	Fe 26 Co 27 Ni 28 55.8 58.9 58.69	
	5	Cu 29 63	Zn 30 65	Ga 31 69	Ge 32 72	As 33 74	Se 34 78.9	Br 35 79		Kr 36 83.8
5	6	Rb 37 85.4	Sr 38 87.3	Y 39 88.9	Zr 40 91.02	Nb 41 92.91	Mo 42 95.9	Tc 43 99.0	Ru 44 Rh 45 Pd 46 101.4 102.9 106	
	7	Ag 47 107	Cd 48 112	In 49 114.3	Sn 50 118.7	Sb 51 121	Te 52 127	I 53 126		Xe 54 131.8
6	8	Cs 55 132	Ba 56 137.6	La 57 138.9	Hf 72 178.6	Ta 73 180.3	W 74 183	Re 75 186.3	Os 76 Ir 77 Pt 78 190.2 193.1 195.2	
	9	Au 79 197	Hg 80 200	Tl 81 204	Pb 82 207	Bi 83 209	Po 84 210	At 85 210		Rn 86 222
7	10	Fr 87 223	Ra 88 226.05	Ac 89 227	Th 90 232.12	Pa 91 231	U 92 238.07			

মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবল

প্রমাণ মিলে গেলো। অ-গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ কোন কোন সময় খুব দুর্বল কোন দ্রাবকে মিশিয়ে নিলেই তারা ঠিক গ্যাসীয় পদার্থের মতোই ব্যবহার করতে থাকে। তবে স্বাভাবিক ভাবেই তো একটা দ্রাবকের মধ্য থেকে তার অণুকে গুনে নেওয়া যায় না।

একজন ফরাসী রাসায়নিক ফ্রাঁসোয়া মেরী রাওল্ট ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করে পথ বাতলে দিলেন।

রাওল্ট দেখালেন ওই দ্রাবকের হিমাঙ্ক আর স্ফুটাঙ্ক নির্ভর করে এর দ্রবণীয় অণুর ওপরেই। অতএব কোন পদার্থের আণবিক ওজন জানা থাকলে অন্য পদার্থের আণবিক ওজনও জেনে নেওয়া সম্ভবপর।

এ ভাবেই একের পর এক আণবিক ওজন ক্রমশ জানা যেতে শুরু হওয়ায় এবার বিজ্ঞানীরা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ আণবিক ওজন জেনে নেওয়ার পর মৌলিক পদার্থগুলোর পারমাণবিক ওজনও জেনে নেওয়া সহজ হলো। অণু সম্পর্কে মানুষের এই অনুসন্ধিৎসা শেষ পর্যন্ত পরমাণু সম্বন্ধে অনেক খবরই জানাতে শুরু করে দিলো। এর পর মানুষের তখন পর্যন্ত জানা মৌলিক পদার্থগুলোর পারমাণবিক ওজন নির্ভুল ভাবেই স্থির করা গেলো।

এরপর ?

এরপর একের পর এক ওই পারমাণবিক ওজন জানা যাওয়ায় বিজ্ঞানীরা ওই সব মৌলিক পদার্থকে তাদের পারমাণবিক ওজন অনুযায়ী সাজিয়ে নেওয়ার একটা প্রয়োজন অনুভব করতে শুরু করলেন।

এ রকম একটা কাজের সত্যিই জরুরী প্রয়োজন ছিলো।

এ রকম একটা ধারণা বিজ্ঞানীদের কেন হয়েছিলো জানো ?

এর কারণ হলো, বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে পরমাণুদের রাসায়নিক গুণাগুণের মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে আর সেই গুণাগুণকে ঘুরে ফিরে অন্যান্য পদার্থের মধ্যেও আসতে দেখা যায়।

ব্যাপারটা নানা দেশের যেমন, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদির বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলতে চাইলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে কাজটি করতে পারলেন জানো ? অর্থাৎ মৌলিক পদার্থদের তাদের পারমাণবিক ওজন অনুযায়ী ঠিক ঠিক একটা তালিকায়

সাজিয়ে দিতে পারলেন ?

যিনি এই চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত কাজটি করলেন তিনি একজন রুশ, নাম দিমিত্রি ইভানোভিচ মেণ্ডেলিফ। তিনি যে তালিকা তৈরি করলেন তার নাম পিরিয়ডিক টেবল।

পরমাণুর গুণাগুণ জানার ব্যাপারে মেণ্ডেলিফের অবদান সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর ওই তালিকা বিজ্ঞানের সামনে প্রথম একটা পরিষ্কার ছবি তুলে ধরলো।

সেই ছবিটা কি রকম ?

ছবিটা হলো পারমাণবিক ওজন কি ভাবে মৌলিক পদার্থের গুণাগুণের সঙ্গে জড়িত। মেণ্ডেলিফ যখন প্রথম তালিকাটি তৈরি করলেন তখন তিনি দেখলেন তিনি তাঁর নীতিতে যদি নির্ভর করে চলেন, অর্থাৎ পদার্থের গুণাগুণ অনুযায়ী যদি সাজিয়ে নিতে থাকেন, যাতে তারা বেশ একটা রাসায়নিক পরিবার হয়েই দাঁড়ায়—তাহলে তাঁর ওই তালিকায় বেশ কয়েকটা ঘর ফাঁকাই পড়ে থাকে।

বেশ একটু সমস্যাতেই পড়ে গেলেন মেণ্ডেলিফ। তিনি ওই ঘরগুলো ফাঁকা রেখে না দিলে মৌলিক পদার্থের ওই পরিবার সাজানোর ব্যাপারটা একেবারে এলোমেলো হয়ে যায়।

ওই সমস্যার সমাধান কি ভাবে তাহলে করলেন মেণ্ডেলিফ ?

মেণ্ডেলিফের মনে ওই মৌলিক পদার্থের গুণাগুণের ফের ঘুরে ফিরে আসার ব্যাপারটা সম্বন্ধে এত দৃঢ় ধারণা জন্মালো যে তিনি শেষ পর্যন্ত ঘরগুলো ফাঁকাই রেখে দিলেন। তিনি বললেন ভবিষ্যতে তখন পর্যন্ত অজানা মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার হলেই ওই নির্দিষ্ট ছেড়ে রাখা ফাঁক ভরে উঠবে।

মেণ্ডেলিফের ওই ভবিষ্যৎবাণী বিফলে যায়নি।

১৮৭৫, ১৮৭৯ আর ১৮৮৬ সালে গ্যালিয়াম, ক্যাণ্ডিয়াম আর জার্মানিয়াম আবিষ্কারের পর ওই ফাঁকগুলো ভরে ওঠে।

কিন্তু মেণ্ডেলিফের ওই আবিষ্কারের ফলে কি জানা গেলো ?

জানা গেলো নিঃসন্দেহে যে মেণ্ডেলিফের ওই পিরিয়ডিক টেবল এক অসাধরণ যুগান্তকারী আবিষ্কার। এটা যেন পরমাণুর অস্তিত্বের এক

জ্বলন্ত প্রমাণ।

এতে বোঝা গেলো প্রত্যেক মৌলিক পদার্থকেই একটা নির্দিষ্ট ওজনের মাপকাঠিতে নিয়ে আসা সম্ভব, যাতে তাদের একটা তালিকায় সাজিয়ে নিয়ে সহজেই তাদের ভৌতিক আর রাসায়নিক গুণাগুণের ব্যাপারটা ওই তালিকায় তাদের অবস্থান দেখেই বলে দেওয়া যায়।

কেমন সহজ আর মজার ব্যাপার একবার ভাবো।

এবার তাহলে পরমাণু কাহিনী কোথায় এসে দাঁড়ালো ?

১৮৯৫ সালে প্রায় আড়াই হাজার বছরের আপ্রাণ চেষ্টা আর অমানুষিক পরিশ্রমের পর বিজ্ঞানীরা বুঝলেন ডেমোক্রিটাসই অভ্রান্ত।

ডেমোক্রিটাস!

নিশ্চয়ই তাঁর কথা ভুলে যাওনি। সেই গ্রীক পণ্ডিত ডেমোক্রিটাস। তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন পরমাণু।

এবার পরিষ্কার ভাবেই সকলে বুঝে নিলো প্রত্যেক মৌলিক পদার্থই ছোট ছোট সূক্ষ্ম কণায় অর্থাৎ পরমাণুতে তৈরি, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণু একই রকম আকৃতি বিশিষ্ট আর তাদের ধ্বংস করা যায় না। আর ওই পরমাণু দিয়েই বিজ্ঞানীরা সব পদার্থের গোলমেলে সমস্ত ভৌতিক আর রাসায়নিক গুণাগুণ বিচার করতে সক্ষম। এই ব্যাপারগুলোই শত শত বছর ধরে সকলকে ধাঁধায় ফেলেছিলো।

তাহলে ?

তাহলে বিজ্ঞানের তো আর কিছুই করার ছিলো না। চারদিকে শান্তি নেমে এলে সারা মানব সমাজই তাহলে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নিতে পারতো। নতুন কিছু তাহলে করারও থাকতো না।

আর তাই যদি হতো তাহলে আমাদের এ কাহিনীরও ওখানেই থেমে পড়ারই কথা।

আর কি হতে পারতো ?

হতে পারতো এই যে মানুষের হিংসা আর মারণাস্ত্র তৈরির কেরামতিটাও ওখানেই থেমে থাকতো। দুনিয়ায় তাহলে পরমাণু বোমার জন্ম হতো না আর সম্পূর্ণ মানুষ জাতটারও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তাহলে থাকতো না।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো ?

হ্যাঁ, আবার সেই সন্দেহের ছায়া নেমে এলো।

পরমাণুর যে ধ্বংস নেই, এটা যে সত্যিই ঠিক কথা নয়। যদিও তখনও পর্যন্ত ওই ধারণাই সকলের ছিলো।

সমস্ত স্বপ্নটাই এবার একদিন ভেঙে খান খান হয়ে গেলো।

এর কারণ ?

এর কারণ হল একজন বিজ্ঞানী আচমকাই একদিন এক অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিচিত্র অদ্ভুত এক আলোর রেখা দেখতে পেয়ে গেলেন।

কিন্তু সেই আলোর রেখা কিসের আর এর সঙ্গে পরমাণুর সম্পর্কই বা কোথায় ?

পরের পরিচ্ছেদেই দেখা যাক।

॥ ছয় ॥

এক্স-রে নামে এক রশ্মি

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ।

ছুনিয়া জুড়েই নানা ধরনের অদ্ভুত আর চমক লাগানো সব আবিষ্কারের ঢেউ উঠেছে।

মানুষ চেষ্টা করে চলেছে উড়তে। সে এক অদ্ভুত খেয়ালী কাণ্ড। কেউ কেউ পাখির মতো ডানা লাগিয়ে ছাদ থেকেও লাফিয়ে পড়ছে।

সারা ছুনিয়াটাই একেবারে যেন তোলপাড়। এসেছে মোটর গাড়ি। এসে গেছে সিনেমা। পুরনো আদ্যিকালের সমস্ত ধ্যান-ধারণার আগল ভেঙে মানুষ যেন নতুন এক ছুনিয়ায় এসে পৌঁছে গেলো।

১৮৯৬ সালে মার্কনি বেতার তরঙ্গে খবর পাঠানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করে সকলকে তাক লাগিয়ে ছাড়লেন। টমাস আলভা এডিসনও একেবারে যাছ এনে দিলেন।

সারা তুনিয়ায় ওই হৈচৈ আর নতুন নতুন আবিষ্কারের ঢেউয়ে মানুষ বুঝি পরমাণুর কথাটাই ভুলে গেলো।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

১৮৯৫ সালের শেষ ভাগ।

হঠাৎ আচমকাই এক অজানা অনামী জার্মান অধ্যাপক উইলহেলম কনরাড রন্টজেন জার্মানীর উজবার্গে এক নতুন ধরনের অদৃশ্য আলো আবিষ্কার করে বসলেন। ওই আলো কাপড়, চামড়া আর দেহের মাংস ভেদ করে গিয়ে শরীরের হাড়ের ছবি আলোকচিত্রের পাতায় ফেলতে পারে।

ব্যাপারটা তখনকার মানুষের মন নিয়ে একটু বিচার করে দেখো।

সারা তুনিয়া ভয়ে প্রায় সিঁটিয়ে গিয়ে ঘটনাটা শুনলো। সত্যিই কি সাংঘাতিক খবর!

সারা বিশ্বের খবরের কাগজগুলোর তো আর কোন কাজই রইলো না। তারা ওই খবর নিয়েই তুনিয়া তোলপাড় করতে শুরু করলো।

রন্টজেনের আবিষ্কার করা ওই রশ্মিটা কি ছিলো? আর এর সঙ্গে আমাদের ওই পরমাণু কাহিনীর সম্পর্কই বা কি?

এ প্রশ্ন একান্ত স্বাভাবিক।

রন্টজেনের ওই রশ্মির নাম 'এক্স-রে' বা রঞ্জন রশ্মি।

এখন দেখা যাক পরমাণু কাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়! আমরা শীগগিরই দেখতে পাবো ওই এক্স-রে রশ্মিই সারা পারমাণবিক ধ্যান-ধারণার একেবারে মূলে আঘাত করে সমস্ত ব্যাপারটাই একেবারে ওলটপালট করে দেয়। কিন্তু সেটা দেখার আগে চলো একবার রন্টজেনের গবেষণাগারে একটু উঁকি মেরে দেখা যাক।

১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসের একটা স্মরণীয় দিন।

দিনটা ছিলো ৮ই নভেম্বর।

রন্টজেন একটা বিচিত্র টিউব নিয়ে কাজ করছিলেন। টিউবের তুটো প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসা পাত একটা বিত্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো। ওই টিউবের নাম ক্রুকস টিউব। এটা আবিষ্কার করেছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুকস। ক্রুকস দেখেছিলেন লম্বা আলুর মতো আকৃতির

ওই টিউবের সমস্ত বাতাস যদি পাম্প করে নিঃশেষে বের করে নিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা যায়, তাহলে ওই টিউবের ঋণাত্মক, অর্থাৎ নেগেটিভ মেরু থেকে (যার নাম ক্যাথোড) বিদ্যুৎ-কণা ছুটোছুটি করতে থাকে। ওই রশ্মির নাম হলো ক্যাথোড-রে বা ক্যাথোড রশ্মি।

রন্টজেন যা পরীক্ষা করে দেখলেন তা হলো ওই ক্যাথোড রশ্মিকে যদি একটা পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাতের জানলার মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া যায়, তাহলে সেই রশ্মি কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে সাহায্য করে। ওই পদার্থকে অ্যালুমিনিয়ামের পাতের জানলার কাছে আনলেই এটা ঘটে।

ওই দিনে রন্টজেন গবেষণাগারে কাজ করার সময় তাঁর ওই ক্রুকস টিউবকে একটা কালো কার্ডবোর্ডের বাক্সে ভরে রেখেছিলেন। বাক্স থেকে কোন ছিদ্রপথে আলো বেরিয়ে আসছে কিনা দেখার জন্য রন্টজেন সুইচ টিপে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করলেন। বাক্স থেকে কোন আলো বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো না।

কিন্তু ভারি আশ্চর্যজনক একটা ঘটনাই ঘটলো।

ঘটনাটা হলো এই রকম :

রন্টজেন দেখলেন গবেষণাগারের কোণে রাখা একটা বেঞ্চের কাছ থেকে একটা অদ্ভুত আলো আসছে।

একটু ধাঁধায় পড়ে রন্টজেন ভাবলেন চোখের ভুল।

কিন্তু বিদ্যুৎ সঞ্চালন বন্ধ করে দিতে ওই আলোটাও আর দেখা গেলো না—অথচ আবার বিদ্যুৎ সঞ্চালন করার পরেই সেই একই দৃশ্য। আবার আলো ফুটে উঠেছে।

ভারি আশ্চর্য হয়ে গেলেন রন্টজেন।

কিসের আলো ওটা ?

রন্টজেন অবাক হয়ে দেখলেন আলোটা আসছিলো একটা টেবিলের পাশে রাখা একটা আলো নিঃসারী বা ফ্লুরেসেন্ট পাতের মধ্য থেকে।

রন্টজেন জানতেন ক্যাথোড রশ্মিতে ওই পাতটায় আলো জ্বলে উঠতে থাকে। আসলে ওই পাত বা পর্দাটা ওই কারণেই রন্টজেন কিনেছিলেন।

রন্টজেন এ কথাও জানতেন যে ক্যাথোড রশ্মি কার্ডবোর্ডের বাক্স ভেদ করে বেরোতে পারে না। তাহলে?

তাহলে কার্ডবোর্ডের বাক্সের মধ্যে ওই ক্রুকস টিউব বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ওই পর্দায় আলো জ্বলে উঠছে কেমন করে?

এর উত্তর একটাই হওয়া সম্ভব, রন্টজেন বুঝতে পারলেন। আর তা হলো, অন্য কোন অজানা রশ্মিতেই ওই আশ্চর্য আলো জ্বলে উঠছে।

রন্টজেন ওই আলোক রশ্মিকে চিনতে না পেরে তার নামকরণ করলেন এক্স-রে বলে।

রন্টজেন কিন্তু ওখানেই থামলেন না। ওই রশ্মি নিয়ে তিনি নানা রকম পরীক্ষা করে চললেন। তিনি দেখতে পেলেন এক্স-রে সমস্ত রকম অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করে যেতে সক্ষম, পাতলা কাঠ, পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাত, দেহের মাংস আর এই রকম আরও নানা জিনিস। ওই রশ্মি শুধু মোটামুটি বাধা পায় শরীরের হাড়ে। আলোকচিত্রের প্লেটের ওপর রেখে রন্টজেন দেখলেন এক্স-রের কাছাকাছি ওই প্লেট কালো হয়ে ওঠে।

রন্টজেনের ওই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে কি হলো?

এ ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহের সঞ্চার হলো চিকিৎসা জগতে।

কারণ কি জানো? কারণ চিকিৎসকেরা দেখলেন শরীরের ভাঙা হাড় বা অস্থির অবস্থান জানতে আর দেহের মধ্যের কোন বস্তুরও অবস্থান জানতে এর তুলনা নেই।

এর ফলে মানব সমাজের দারুণ উপকার যে হলো তাতে সন্দেহ ছিলো না।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো এর সঙ্গে আমাদের পরমাণু কাহিনীর সম্বন্ধ কোথায়?

এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে রন্টজেনের গবেষণাগার ছেড়ে এবার আমাদের নজর দিতে হবে ফ্রান্সের একজন নামকরা পদার্থ-বিজ্ঞানীর ওপর। তিনি সেখানে চেষ্টা করছিলেন ক্যাথোড টিউব ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এক্স-রে পাওয়া যায় কি না।

॥ সাত ॥

আরও গবেষণা

রন্টজেনের আবিষ্কার সারা বিশ্বের সামনে এক নতুন জগতেরই দ্বার খুলে ধরেছিলো।

রন্টজেনের এক্স-রে আবিষ্কারের সময় আর এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরি আতোঁয়া বেকেরেল ইউরেনিয়াম নামের একটা মৌলিক ধাতব পদার্থ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। ইউরেনিয়ামের এক বিশেষ গুণ, এর মধ্য থেকে আলোক রশ্মি নির্গত হতে থাকে।

বেকেরেল ভাবলেন তিনি ইউরেনিয়ামের কিছু সল্ট বা লবণ সূর্যের সামনে রেখে আলোক রশ্মি নির্গত হয় কি না দেখবেন।

তিনি একটা আলোকচিত্রের কাগজের টুকরো কালো কাগজে মুড়ে তার ওপর কিছু ইউরেনিয়ামের সল্ট নিয়ে কিছুক্ষণ রোদ্দুরে রেখে দিলেন। তারপর সেই আলোকচিত্রের প্লেট নিয়ে ডার্করুমে গিয়ে ঢুকলেন।

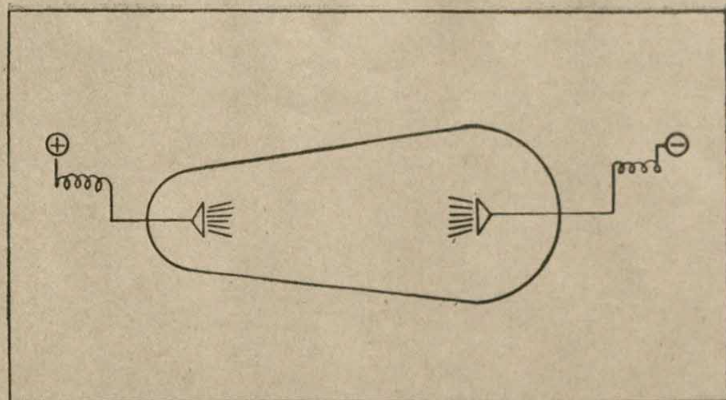
এর ফলাফল কেমন হলো জানো ?

বেকেরেল দারুণ উল্লসিত হয়ে দেখলেন যে ছবিতে ইউরেনিয়াম সল্ট বা লবণের চারপাশের একটা সীমারেখা চমৎকার পরিষ্কার হয়েই ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ ওই কালো কাগজ ভেদ করেই রশ্মি আলোকচিত্রের প্লেটের বুকে পড়েছে।

এতে কি প্রমাণ হলো ?

প্রমাণ হলো ক্রুকস টিউব ছাড়াই এক্স-রে পাওয়া সম্ভব।

বেকেরেল ছিলেন দারুণ খুঁতখুঁতে মানুষ। তিনি নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে আবার পরীক্ষাটা করতে চাইলেন। চেষ্টা করতে গিয়ে কিন্তু দারুণ একটা মুশকিলে পড়ে গেলেন বেকেরেল। ব্যাপারটা হলো ভারি মজার। ১৮৯৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে তিন-তিনটে দিন তিনি সূর্যের মুখ দেখতে



ক্রুকস টিউব

পেলেন না। মেঘের আড়ালে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে রইলো সূর্য।

শেষ পর্যন্ত তাহলে কি করলেন বেকেরেল?

বেকেরেল একরকম হতাশ হয়েই সেই আলোকচিত্রের প্লেটটা কালো কাগজে মুড়ে তার ওপর ইউরেনিয়ামের এক টুকরো স্ফটিক রেখে সবটাই গবেষণাগারের একটা আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখে দিলেন। সূর্য উঠুক, তারপর পরীক্ষাটা করা যাবে, এরকম কিছুই হয়তো তিনি ভেবেছিলেন।

কিন্তু তিনদিন পরে হঠাৎ কি মনে হওয়ায় বেকেরেল ওই আলোকচিত্রের প্লেটটা ডেভেলপ করে বসলেন। একটু অধৈর্যই হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

ফলাফলটা কিরকম হলো জানো?

ফলাফল দেখে বেকেরেল দারুণ চমকে গেলেন। আলোকচিত্রের প্লেটের বুকে গাঢ় রঙের একটা ছায়া পড়েছে।

একটা দারুণ ঐতিহাসিক আবিষ্কার করে বসলেন বেকেরেল।

সত্যিই এক ঐতিহাসিক আবিষ্কার!

কারণ কোনরকম বাইরের শক্তি ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই ওই স্ফটিক থেকে রশ্মি নির্গত হয়ে চলেছিলো। সে রশ্মি এক্স-রে বা অন্য যে কোন রশ্মিই হোক না কেন।

বেকেরেল সহজে কোন কিছু মেনে নেওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না, আগেই বলেছি তিনি ছিলেন অসম্ভব খুঁতখুঁতে। তিনি আবার একইভাবে পরীক্ষাটা করলেন। সম্পূর্ণ এক অন্ধকার ঘরে পরীক্ষা করে একই ফলাফল দেখতে পেলেন তিনি।

বেকেরেল এবার নিঃসন্দেহ হয়েই তাঁর যুগান্তকারী ওই আবিষ্কারের কথা বিজ্ঞান জগতের কাছে প্রকাশ করে দিলেন।

এবার কি হলো জানো?

ওই ঘটনার কথা প্যারী শহরের এক ভারি গরীব পোলিশ উদ্বাস্তুর কানে পৌঁছলো। সেই উদ্বাস্তুটি একজন মহিলা—নাম মেরি স্কোডোভস্কা। প্যারী শহরে পৌঁছে মেরি স্কোডোভস্কা তাঁরই মতো আর একজন গরীব বিজ্ঞানী পিয়ের কুরীকে বিয়ে করেছিলেন। স্বামীর মতো মেরিও ছিলেন বিজ্ঞানের একজন একনিষ্ঠ সাধিকা।

ওই বিজ্ঞানপিপাসু মহিলাটি কে জানো ?

হ্যাঁ, তিনিই সেই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরী।

কিন্তু একটা কথা।

কথাটা হলো, এ কাহিনী তো পদার্থের মধ্য থেকে নির্গত রশ্মির কথা। এ কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পরমাণু কাহিনী থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি না তো ?

না, তা যাচ্ছি না।

কারণ বেকেরেলের আবিষ্কারের কাহিনী শুনে মাদাম কুরী যুক্তি দিয়ে বুঝেছিলেন যে ওই রকম রশ্মি বিকিরণের যুক্তিসঙ্গত কারণ লুকিয়ে আছে ইউরেনিয়ামের পরমাণুর মধ্যেই। কারণ ইউরেনিয়ামের কোন যৌগিক পদার্থের মধ্য থেকে কিন্তু কোন রশ্মি নির্গত হয় না।

এবার বুঝেছো পরমাণুর সঙ্গে এ কাহিনীর সম্পর্ক কোথায় ?

কিন্তু এরপর কি হলো ?

এরপর পিয়ের আর মাদাম কুরী প্রাণপাত পরিশ্রম করে জানতে চেষ্টা করতে শুরু করলেন ওই রশ্মির উৎস কোথায়। ইউরেনিয়ামের উৎস ছিলো পিচব্লেণ্ড নামের এক খনিজ পদার্থের মধ্যে। মাদাম আর পিয়ের কুরী আপ্রাণ চেষ্টায় পিচব্লেণ্ড থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করতে সক্ষম হলেন।

এবার তাঁদেরই আশ্চর্য হওয়ার পালা।

সেটা কি রকম নিশ্চয়ই জানতে চাইবে সকলে।

সেটা হলো, পিচব্লেণ্ড থেকে বের করে আনা ইউরেনিয়াম পরীক্ষা করে মাদাম আর পিয়ের কুরী দেখলেন ওই ইউরেনিয়াম থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির তেজ মূল পিচব্লেণ্ডের রশ্মির মতো তত জোরালো নয়।

মাদাম কুরীর কাছে এর একটাই মাত্র অর্থ ছিলো—ইউরেনিয়াম ছাড়াও ওই রশ্মি নির্গত হওয়ার আরও একটা জোরালো উৎস আছে।

এ ব্যাপারটা মাদাম কুরীর কাছে হয়ে দাঁড়ালো একটা চ্যালেঞ্জের মতো।

ওই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা না করা পর্যন্ত তাঁর যেন শান্তি রইলো না মনে। ওই রশ্মির উৎস তাঁকে জানতেই হবে, যেভাবেই হোক, যতদিন লাগে লাগুক। তাতে প্রাণপাত করতেও প্রস্তুত তিনি। এমনই একাগ্রতা।

এরও কারণ ছিলো।

সেও ওই পরমাণু।

কারণ মাদাম কুরী দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন ওই রশ্মি নির্গত হয় পরমাণু থেকেই। অন্য কেউ হলে হয়তো ওই কঠিন কাজ এড়িয়ে হাত গুটিয়েই নিতেন। কিন্তু মাদাম কুরীর চরিত্র ছিলো শক্ত ধাতুতে তৈরি। হার স্বীকার করার মতো বিজ্ঞানী তিনি মোটেই ছিলেন না।

কিন্তু সঙ্গতি কোথায় ব্যয়বহুল কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো?

পিয়ের আর মাদাম কুরীর গবেষণাগার বলতে তো এক ভাঙা ছাদওয়ালা ঘর। বর্ষায় তা ফুঁড়ে অনবরত জল ঝরতে থাকে।

কিন্তু সব অসুবিধাই দূরে সরিয়ে দিলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনে। সাহায্য করলো তাঁদের অদম্য অমমনীয় উৎসাহ আর অস্ট্রিয় সরকার।

নানা কষ্টসাধ্য পরীক্ষার পর মাদাম আর পিয়ের কুরী আবিষ্কার করলেন এক নতুন পদার্থ।

সামান্য কিছু স্ফটিক! ওই স্ফটিক থেকে অনেক বেশি রশ্মিই নির্গত হয়ে চলেছিলো।

ঈশ্বর তাদের সাফল্য এনে দিলেন।

তাঁদের চেষ্টায় টেস্ট টিউবের তলায় যে নতুন এক পদার্থের জন্ম হলো তার নাম রেডিয়াম।

পৃথিবীর প্রথম রেডিয়াম।

ইউরেনিয়ামের পিণ্ড থেকে রেডিয়াম বের করার সময় মাদাম আর পিয়ের কুরী দ্বিতীয় আর একটা রশ্মি বিচ্ছুরণের পদার্থও আবিষ্কার করলেন। মাদাম কুরীকে সম্মান জানাবার জন্যেই তাঁর স্বদেশের নামে ওই পদার্থের নাম দেওয়া হলো পোলোনিয়াম।

পদার্থের ওই রশ্মি বিকিরণের নাম হলো তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও অ্যাক্টিভিটি।

কিন্তু ওই রহস্যের কি ওখানেই শেষ?

না, তা হলো না।

মাদাম আর পিয়ের কুরীর জ্ঞানার্জন স্পৃহার যে কোন শেষ ছিলো না।

তাঁরা থামতে জানতেন না। রেডিয়াম নিষ্কাশনের নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে রইলেন তাঁরা। এ কাজে তাঁরা কতখানি পিচব্লেণ্ড নামের সেই খনিজ ব্যবহার করেছিলেন শুনলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে।

এক আউন্সের তিনশো ভাগের এক ভাগ রেডিয়াম নিষ্কাশনের জন্য তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন এক টন পিচব্লেণ্ড!

কি অসাধারণ ধৈর্য আর একাগ্রতা। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই।

রেডিয়াম আবিষ্কার চিকিৎসা জগতের সামনেও এক নতুন দিগন্তের দরজা খুলে ধরলো। ক্যান্সার রোগ নিরাময়ের জন্যই ওই রেডিয়াম ব্যবহার শুরু হলো। মানুষ তাই কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো কুরী দম্পতির কাছে।

কিন্তু সে কথা থাক।

আমরা আবার ফিরে যাই চলো পরমাণুর কথায়।

মাদাম কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কারের সময় পর্যন্ত আমরা জেনেছি পরমাণুই পদার্থের শেষ কথা, তার ধ্বংস নেই।

কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছরে ওই তেজস্ক্রিয়তা বা রশ্মি বিকিরণের ব্যাপারটা আবিষ্কার হওয়ার ফলে পরমাণুর দুর্ভেদ্য দুর্গটা যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

মাদাম কুরীর আবিষ্কারের সার্থকতা এখানেই।

॥ আট ॥

পরমাণু থেকে রশ্মি

এবার আমরা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম যখন পরমাণুর ধ্যান-ধারণা আগেকার সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে প্রায় নস্যাৎ করে ফেলার কোন এক যুগে পৌঁছে গেলাম।

আর এই চমকপ্রদ ঘটনা ঘটলো ওই তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হওয়ার ফলেই।

কিন্তু এবার এগিয়ে যাওয়ার আগে এসো আর একবার সামান্য পিছিয়ে যাই সেই ১৮৫৮ সালের কাছাকাছি। ওই সময় প্লাকার নামে একজন জার্মান গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে দেখেছিলেন ঋণাত্মক বা নেগেটিভ মেরুর কাছাকাছি একটা আলোর রেখা ফুটে উঠছে।

এরও কুড়ি বছর পরে আরও একজন জার্মান, গোল্ডস্টিন, দেখলেন ওই আলো যার রঙ ঈষৎ নীলাভ, আসছে ঋণাত্মক মেরু বা ক্যাথোড থেকে—তাই ওই আলোর নাম রাখা হলো ক্যাথোড রশ্মি। তিনি আরও পরীক্ষা করে দেখলেন চুম্বকের সাহায্যে ওই রশ্মির গতিপথ বদলানো সম্ভব। কিন্তু বিদ্যুতের সাহায্যে সেই গতিপথ তিনি বদল করতে পারলেন না।

ঠিক ওই সময়েই হাজির হলেন ক্রুকস। ক্রুকস খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শূন্য কাঁচের টিউব তৈরি করতে পারতেন। প্রায় ছ বছর ধরে ওই রকম টিউবে তিনি নানা পরীক্ষা চালালেন।

ওই পরীক্ষার ফলাফল কি রকম দাঁড়ালো?

পরীক্ষা করে তিনি প্রমাণ করলেন যে ওই ক্যাথোড রশ্মি কিছু বিদ্যুৎ-কণা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

১৮৯৫ সালে জাঁ ব্যাপটিস্ট পেরি নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী এক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ওই একই কথা প্রমাণ করলেন যে ওই ক্যাথোড রশ্মি

বিদ্যুৎ কণিকা ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু কি ধরনের বিদ্যুৎ-কণা ?

সন্দেহ থেকেই গেলো।

এবার ইংল্যাণ্ডে এক বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী জে. জে. থমসন হাত লাগালেন। থমসন ওই টিউবের মধ্যের সব বাতাস বের করে নিয়ে দেখালেন ক্যাথোড রশ্মিকে বিদ্যুৎক্ষেত্রের সাহায্যে গতিপথ বদলাতে বাধ্য করা যায়। গোল্ডস্টিন যা করতে পারেননি থমসন তাই করে দেখালেন।

এতে আর কি দেখা গেলো ?

দেখা গেলো ক্যাথোড রশ্মি ধনাত্মক বা পজিটিভ মেরুর দিকেই ছুটতে চায়।

এর সাহায্যে থমসন কি প্রমাণ করলেন জানো ?

থমসন প্রমাণ করলেন যে ক্যাথোড রশ্মিতে নিঃসন্দেহে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক বিদ্যুৎ কণিকা বা চার্জ আছে। কারণ বিপরীত মেরুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

এই বিদ্যুৎ কণিকার নাম ইলেকট্রন।

এবার আরও একটা তত্ত্ব প্রমাণ করলেন আমাদের সেই আগেকার পরিচিত বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেকেরেল। ১৮৯৯ সালে বেকেরেলই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন পদার্থ থেকে আলোকরশ্মি নির্গত হয়। এবার তিনিই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন চুম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে ক্যাথোড রশ্মির মতো ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত রশ্মির গতিপথকেও ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভবপর।

তিনি এও প্রমাণ করলেন ইউরেনিয়ামের ওই রশ্মিও সন্দেহাতীত ভাবেই নেগেটিভ রশ্মি। বেকেরেল দেখালেন ক্যাথোড রশ্মি আর ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত রশ্মি অভিন্ন, দুটোই নেগেটিভ রশ্মি।

এর অনুসিদ্ধান্ত একটাই হওয়া সম্ভব ঃ

আর তা হলো, ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে নির্গত রশ্মি হলো পদার্থের কিছু কণা যার মধ্যে আছে ঋণাত্মক চার্জ আর তা ক্যাথোড রশ্মির মতো একই রকম।

ওই রশ্মির নামকরণ হলো বিটা রশ্মি।

এখানে কিন্তু আরও একটা কাহিনী জন্ম নিলো।

সেটা কি রকম?

সেটা হলো বেকেরেল যখন ফ্রান্সে রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন ঠিক ওই সময়ে আবার ইংল্যাণ্ডেও একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী কেমব্রিজে বসে ওই রশ্মি নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম আর্নেস্ট রাদারফোর্ড।

রাদারফোর্ড বেশ মজার একটা পরীক্ষা চালালেন। তিনি রশ্মি নির্গত হয় এমন এক পদার্থ নিয়ে দেখলেন যে ওই রশ্মিকে একটা পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাতের কাছাকাছি আনলেই কিছু রশ্মি যদিও ওই পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাত ভেদ করে যেতে পারে, কিছু রশ্মি কিন্তু ওই পাত ভেদ করতে পারে না।

রাদারফোর্ড রশ্মি দুটোর নামকরণ করতে গিয়ে গ্রীক বর্ণমালার দুটো অক্ষর বেছে নিলেন।

যে রশ্মি অ্যালুমিনিয়ামের পাত ভেদ করতে সক্ষম তিনি তার নাম দিলেন বিটা রশ্মি আর যে রশ্মি পাত ভেদ করতে পারলো না তার নাম দিলেন আলফা রশ্মি।

বেকেরেল ওই প্রথম রশ্মিকেই ক্যাথোড রশ্মি বলেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত আরও একটা রশ্মিও আবিষ্কার হয়। এরও নাম ওই গ্রীক বর্ণমালা অনুযায়ী রাখা হয় গামা রশ্মি। ওই রশ্মিও নির্গত হয় ইউরেনিয়াম থেকে।

এর পর?

এর পর চলো ১৮৯৯ সালের দিকে একটু তাকানো যাক। সেই মাদাম আর পিয়ের কুরী যখন তাঁদের গবেষণাগারে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। কোন কিছুই যে তাঁদের নজর এড়িয়ে যেতে পারতো না।

তাঁরা দেখলেন যে তাঁদের আবিষ্কৃত সেই রেডিয়ামের কাছাকাছি কোন জিনিস থাকলে তার মধ্যেও কিছু তেজস্ক্রিয়তা দেখা দেয়।

ঠিক ওই সময়েই একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার্ট বাউই ওয়েনস আবার দেখলেন যে থোরিয়াম নামের এক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত

রশ্মি এক দমক বাতাসে পথ পরিবর্তন করে বসে।

ব্যাপারটা সত্যিই দারুণ মজার আর অদ্ভুত বলতে হয়। কারণ সত্যিকার রশ্মি বাতাসে এক কণাও পথ বদলায় না। তাহলে?

ব্যাপারটা রাদারফোর্ডকেও ভাবিয়ে তুললো।

রাদারফোর্ড সহজে হার মানবার মানুষ নন। এক বছরের মধ্যেই তিনি দেখলেন থোরিয়াম থেকে একটা তেজস্ক্রিয় গ্যাস বের হয়। বাতাসে পথ বদলায় ওই গ্যাসই।

তিনি আরও প্রমাণ করলেন যে ওই গ্যাস খুবই ক্ষণস্থায়ী, এটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উবে যায় আর এর সংস্পর্শে আসা বস্তুর ওপর সে কিছু তেজস্ক্রিয় তলানি রেখে যায়। ওই তলানিই কুরীদের পরীক্ষার সেই দৃষ্টান্ত।

ভারি গোলমেলে ব্যাপারই বটে। এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থের জন্ম!

তাহলে কি সেই অ্যালকেমিস্টরাই ঠিক? আবার তাদের ভূত মানুষের ঘাড়ে চাপতে চলেছে নাকি? তাহলে কি এক পদার্থকে অন্য পদার্থে পরিবর্তিত করে নেওয়া সম্ভব?

কিন্তু পরের বছরেই সব সন্দেহের নিরসন হয়ে গেলো।

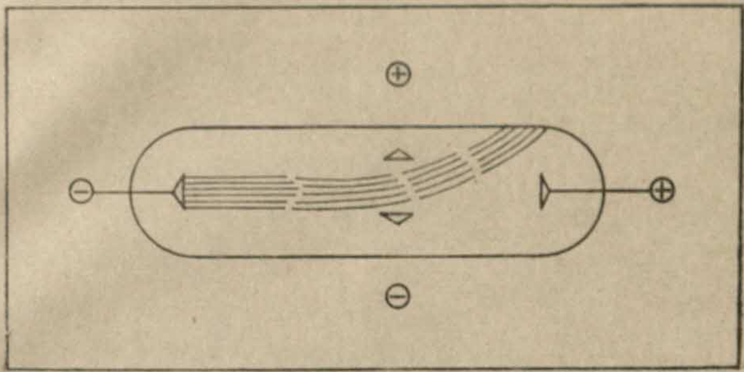
১৯০০ সালে রাদারফোর্ড আর তাঁর এক তরুণ সহকারী ফ্রেডেরিক সডি এর একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়ে গেলেন।

পরমাণু বিজ্ঞানের ওপর যে সন্দেহের কালোছায়া নেমে আসছিলো তাঁরা সেই ছায়াকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলেন.

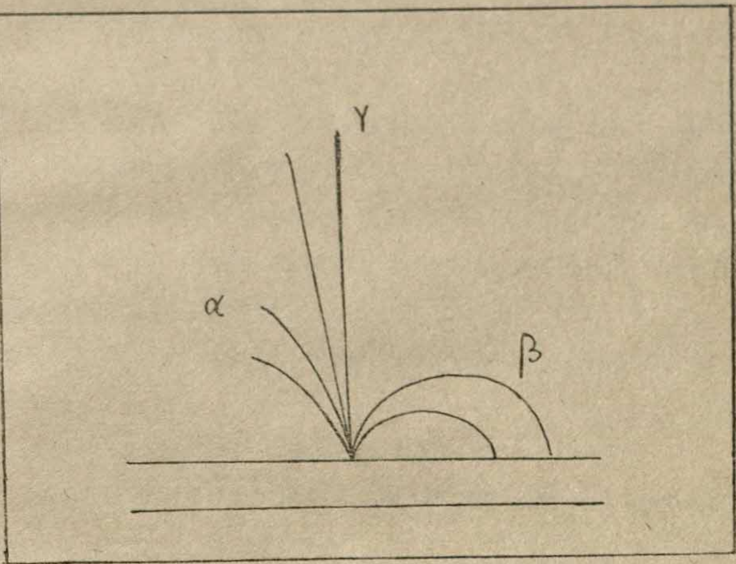
একটা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তাঁরা বেকেরেলের আবিষ্কৃত পরমাণু থেকে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ কণা আর ওয়েনসের গ্যাস, দুটোরই ব্যাখ্যা হাজির করলেন।

কি সেই ব্যাখ্যা?

সে ব্যাখ্যা হলো, রাদারফোর্ড আর সডি বোঝালেন যে পরমাণু বিভাজন আর বিদ্যুৎ কণিকা নির্গত হাওয়ার ফলে একটা নতুন আর আগের চেয়ে হালকা পদার্থ, যার ভৌত আর রাসায়নিক গুণাগুণ মূল মৌলিক পদার্থের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, পড়ে থাকে।



থমসনের ক্যাথোড রশ্মির পরীক্ষা



আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি

ব্যাপারটা বুঝতে পারছো কি ?

এ যে সাংঘাতিক কথা !

ওই দুজন ইংরাজ বিজ্ঞানী আসলে যা বলতে চাইছিলেন তার অর্থ হলো পরমাণু আর অ-ধ্বংসযোগ্য নয়—অর্থাৎ বড় বড় তেজস্ক্রিয় পরমাণুরা টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট পরমাণু হয়ে জন্ম নেয়।

তাঁরা আরও বোঝালেন তেজস্ক্রিয়তা এমন একটা ব্যাপার যার ফলে নতুন নতুন পদার্থের জন্ম হয়।

আর ?

আর ওই পরিবর্তন চলেছে পরমাণুর অভ্যন্তরেই।

এ কথার মোটামুটি সহজ সরল মানেটা কি ?

এর সহজ সরল অর্থ হলো, পরমাণু টুকরো টুকরো হয়ে চলেছে !

সমস্ত বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণাই যেন ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে একেবারে পালটে গেলো।

আর সেটা সমাধা করলেন সেই বিখ্যাত রাদারফোর্ড আর তাঁর তরুণ সহকারী ফ্রেডেরিক সডি।

পুরনো দিনের সমস্ত কল্পনার তাসের প্রাসাদ যেন এক নিমেষেই ভেঙে পড়তে চাইলো।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা সহজে হার মানলেন না। তাঁরা যেন একদল যোদ্ধা। তাঁরা তাই লড়াই করতে চাইলেন, সহজে ওই তত্ত্বটাকে মেনে নিলেন না। কিন্তু রাদারফোর্ড আর সডিও শক্ত ধাতের মানুষ। তাঁরাও তাঁদের পরমাণু বিভাজনের নীতি আঁকড়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত সকলকে তাঁদের তত্ত্বকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে হলো।

তাহলে বুঝেছো পরমাণু বিজ্ঞান এবার কোথায়, কোন্ স্তরে এসে দাঁড়ালো ?

আড়াই হাজার বছরের ফলশ্রুতি হলো বুঝি এই।

কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। এই তো সবে নতুন এক যুগের সূচনা হলো।

বিজ্ঞান জগৎ এখন পরমাণুকে টুকরো টুকরো করার রহস্য জানার পর

আবার নতুন উৎসাহে সবকিছু খতিয়ে দেখতে আগ্রহী হয়ে উঠলো।

পরমাণু তত্ত্ব আজ যেখানে এসে দাঁড়ালো তাতে কাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, এ কথা একটু স্মরণ করে নেওয়া যাক।

এ কাজ করলেন সেই গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস—আর তারপর তাঁর আরব্ধ কাজ করে চললেন মাদাম কুরী, বেকেরেল, ওয়েনস, রাদারফোর্ড আর সডি—আর তাঁদের সঙ্গে আরও অসংখ্য বিজ্ঞানী যাঁদের সকলের নাম হয়তো আমরা জানি না। তাঁদেরও দান শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করতে হবে বইকি।

তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম ?

জানতে পারলাম পরমাণুকে ঋণাত্মক আর আজও অজানা অন্য কিছু কণায় ভেঙে ফেলা সম্ভব।

বিজ্ঞানের সামনে এখন একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়ালো।

সে প্রশ্ন হলো সবকিছু এক জায়গায় জড়ো করে পরমাণুর এবারে একটা নিখুঁত ছবি আঁকা। এটাই এখন একমাত্র জরুরী কাজ হয়ে মানুষের সামনে এসে দাঁড়ালো।

পরমাণু যে একটা গোলাকৃতি কঠিন পদার্থ একথা আর মেনে নেওয়ার মতো পরিস্থিতি রইলো না।

বিজ্ঞান তাহলে মানুষকে এর বদলে অন্য কি ধারণা দিতে পারে ?

দেখা যাক।

॥ নয় ॥
পরমাণু কেন্দ্র

নবলব্ধ জ্ঞানের আলোয় পরমাণুকে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী জে. জে. থমসন।

জে. জে. থমসনই আবিষ্কার করেন তখন পর্যন্ত জানা বিদ্যুৎ কণিকা ইলেকট্রন। ওই ইলেকট্রনকে অবলম্বন করেই থমসন তাঁর পরমাণুর একটা ছবি আঁকার চেষ্টা চালালেন।

এখন কথা হলো বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী কোন রকমেই এক গুচ্ছ ইলেকট্রনই শুধু একটা পরমাণুর মূল হতে পারে না, এটা ধ্রুব সত্য।

তার প্রথম ও প্রধান কারণ হলো একই ধরনের বিদ্যুৎ কণিকা পরস্পরকে সব সময়েই দূরে ঠেলে দেয় বা বিকর্ষণ করে চলে। আবার প্রকৃতির কোন এক আশ্চর্য নিয়মের ফলে তা যদি ঘটেও থাকে তাহলে সব পদার্থই হবে ওই ঋণাত্মক বা নেগেটিভ বিদ্যুৎ বিশিষ্ট।

ব্যাপারটা কি রকম বুঝতে পারছো?

তাহলে আমরা সকলে সব সময়েই ঋণাত্মক ওই বিদ্যুৎ কণা বয়ে নিয়ে বেড়াতাম।

অতএব ওই বাধা দূর করার ব্যাপারে জে. জে. থমসন ব্যাখ্যা করলেন যে পরমাণু এক ধনাত্মক বা পজিটিভ বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে তৈরি যা ওই ঋণাত্মক কণিকা অর্থাৎ ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে দৃঢ় ভাবেই ধরে রাখে।

দুর্ভাগ্যবশত বিজ্ঞান জগৎ কিন্তু এত সহজে ব্যাখ্যাটা মেনে নিলো না।

তাঁরা বললেন: বেশ কথা। ইলেকট্রনই যে পরমাণুর অঙ্গ সেটাই শুধু মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এরপর?

আবার বিজ্ঞান জগৎ এটাও জানতেন, তাঁরা থমসনের ধনাত্মক বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের কথাটা যদি বাতিল করে দিতে চান, যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের

ভেসে বেড়ানোর কথা, তাহলে ঋণাত্মক ইলেকট্রনকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রাখার জন্য অবশ্যই কোন ধনাত্মক কণিকা থাকতেই হবে।

আসল কথা হলো, ইলেকট্রন আবিষ্কারের সময় থেকেই ধনাত্মক কোন কণিকার খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এটাই তো একান্ত স্বাভাবিক যে একটা ঋণাত্মক বা নেগেটিভ কণা আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা তার বিপরীত একটা কণিকা, অর্থাৎ ধনাত্মক বা পজিটিভ কণিকার খোঁজ শুরু করবেন।

এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম মাথা ঘামিয়েছিলেন সেই গোল্ডস্টিন।

গোল্ডস্টিন একটা ক্যাথোড রশ্মির টিউব নিয়ে খুব কৌশলে ক্যাথোডের গায়ে কিছু ফুটো করে নিলেন। তাঁর ধারণা হলো টিউবের মধ্যে কিছু ধনাত্মক কণা থাকলে সেগুলো নিশ্চয়ই ক্যাথোড বা ঋণাত্মক মেরুর দিকেই ছুটে আসবে। আর সেই কণা গতিবেগের ফলে ওই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

আর হলোও তাই।

গোল্ডস্টিন টিউবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলেন যে ওই ফুটোর মধ্যে আলোর শিখা জ্বলে উঠছে।

যেহেতু ফুটোর মধ্য দিয়ে আসছে তাই তিনি ওই আলোর নামকরণ করলেন 'ক্যানাল রশ্মি'।

১৮৮৫ সালে পেরি নামের সেই বিজ্ঞানী ফ্যারাডে সিলিণ্ডার নামের এক চোঙের মধ্যে ওই ক্যানাল রশ্মিকে ধরে ফেললেন।

এবার কি হলো?

এবার পরিষ্কার ভাবেই তিনি প্রমাণ করলেন যে ওই রশ্মি ঋণাত্মক ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এবার পরমাণু বিজ্ঞান এসে কোথায় পৌঁছলো?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক। এর উত্তর হলো এই যে মানুষ ধাপে ধাপে পরমাণুর সঠিক গঠন জানার পর্যায়েই বুঝি পৌঁছে গেলো।

তারপর?

এই সময় একজন জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেলম ওয়েইন ওই বিদ্যুৎ-কণাদের ওজন আর বিদ্যুতের পরিমাণের একটা সম্পর্কের পরিমাপ করে ফেললেন।

এতে তিনি কি দেখলেন জানো ?

তিনি সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণ করলেন যে ওই ধনাত্মক কণিকার ওজন ঋণাত্মক ওই ইলেকট্রনের চেয়ে ঢের বেশি।

তবে এখানেও একটা কথা।

বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না যে ওই ক্যানাল রশ্মিই ঠিক ঠিক ইলেকট্রনের বিপরীত পরমাণুর মধ্যের সেই ধনাত্মক কণিকা কি না।

নাঃ, বিজ্ঞানীদের সমস্যার শেষ হলো না। তাঁরা আবার নতুন উদ্যমে অন্য ভাবে সেই ধনাত্মক কণার খোঁজ করতে শুরু করলেন।

এ কাজে আবার কে সফল হলেন জানো ?

সেই অতি বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড। তিনিই ছিলেন পরমাণুর প্রকৃত শিল্পী।

এবার তাই রাদারফোর্ডের গবেষণাগারের দিকে একটু দৃষ্টি মেলে ধরি এসো।

রাদারফোর্ড সেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়েই গবেষণা করে চলেছিলেন। বিটা রশ্মির ব্যাপারটা তো মিটেই গেছে কিন্তু আসলে গোলমাল বাধিয়ে তুলেছে আলফা রশ্মি। এটা তখনও এক রহস্য হয়েই আছে।

পরীক্ষায় মাঝে মাঝে মনে হয় আলফা রশ্মিতে কোন রকম বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। আবার এও প্রমাণ হয়েছে আলফা রশ্মি ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জ বহন করে চলে।

তাহলে কেন এই রহস্য ?

রাদারফোর্ড ওই রহস্য ভেদ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। ছাত্রদের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করলেন আলফা রশ্মির মধ্যে সত্যিই ধনাত্মক কণিকা আছে তিনি আরও দেখলেন আলফা রশ্মি আসলে ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণু ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাদের প্রতিটির আয়তন হাইড্রোজেন পরমাণুর চার গুণ।

রাদারফোর্ডের সহকারী বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক সডিও বুঝলেন যে আলফা কণিকা নিঃসন্দেহে হিলিয়ামের কেন্দ্রীভূত অংশ।

এটা প্রমাণ করার জন্য সডি সামান্য কিছু রেডিয়াম ব্রোমাইড জলে গুলে

নিলেন। এর ফলে কিছু গ্যাস বেরিয়ে এলো। ওই গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করার সঙ্গে সঙ্গেই যে আলোর শিখা দেখা গেলো সেটা নিঃসন্দেহে হিলিয়াম গ্যাসেই সম্ভব।

অতএব প্রমাণ হলো ওই গ্যাস হিলিয়াম।

কিন্তু বিজ্ঞান জগৎ সহজে এ কথায় আস্থা রাখলেন না। তাঁরা দাবি করলেন আরও প্রমাণ চাই। আরও জোরালো প্রমাণ।

বেশ কথা!

এগিয়ে এলেন সেই মহাবিজ্ঞানী রাদারফোর্ড। প্রমাণ তিনিই দেবেন।

রাদারফোর্ড দেখলেন অলিফা কণিকার গতিবেগ প্রচণ্ড, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৯০০০ হাজার মাইল থেকে প্রায় ১২০০০ হাজার মাইল।

ভাবো কি অসম্ভব গতি!

আর ওই রকম প্রচণ্ড গতিবেগের জন্যই অত ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও তারা কাছাকাছি রাখা কোন শক্ত জিনিসও ভেদ করতে সক্ষম। যেমন এক ইঞ্চির এক হাজার ভাগের এক ভাগ পুরু কাঁচ।

রাদারফোর্ডের মতো প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর কাছে এ ব্যাপারটা একটা নতুন আলোর সন্ধান এনে দিলো। তিনি তো তাহলে বিশেষভাবে তৈরি ওই রকম পুরু কাঁচের টিউবে ওই আলফা কণিকাদের ধরে রাখতে পারেন।

কিন্তু রাদারফোর্ডের মাথায় খুব কৌশলী একটা চিন্তাই ঘুরপাক খেয়ে চলেছিলো। তিনি ভাবলেন ওই আগের টিউবের ওপরে আরও একটা কাঁচের টিউব ভরে নিলে কেমন হয়?

অবশ্য দ্বিতীয় ওই কাঁচের টিউবের কাঁচ হবে দারুণ পুরু। যাতে ওই আলফা কণিকারা প্রথম টিউবের কাঁচ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেও দ্বিতীয় টিউবের মাঝখানে ধরা পড়ে যায়। কারণ ওই কণিকারা দ্বিতীয় টিউবের কাঁচ ভেদ করতে পারবে না।

ঠিক যেন ফাঁদে ফেলে ইঁদুর ধরা আর কি।

ওই টিউবটা দিন কয়েক ফেলে রেখে একদিন সেটা পরীক্ষা করলেন রাদারফোর্ড।

তিনি ফাঁদে ফেলে ধরেছেন কিছু ঠিকই।

তবে আলফা কণিকা নয়। যা তিনি ধরেছেন, তা হলো একটা গ্যাস।

রাদারফোর্ড যা ভেবেছিলেন সেই গ্যাসই। সেই গ্যাস হলো হিলিয়াম গ্যাস। ওই পরীক্ষার ফলে অনেক রহস্যই পরিষ্কার হয়ে গেলো।

ব্যাপারটা আসলে কি?

আসলে যা ঘটেছিলো তা হলো ওই আলফা কণিকারা তাদের দুটো করে ধনাত্মক চার্জ নিয়ে প্রথম টিউব ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়েই ভেসে বেড়ানো ইলেকট্রনের সংস্পর্শে এসে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে ভালোমানুষের মতোই বিদ্যুৎ চার্জবিহীন পরমাণুতে পরিণত হয়ে পড়েছে। যে পরমাণু এর ফলে জন্ম নিলো তা হলো সেই হিলিয়াম গ্যাসের।

আলফা কণিকাদের রহস্য মোটামুটি এবার মিটে গেলো। প্রমাণ হলো তারা দুটো ঋণাত্মক চার্জ হারানো হিলিয়াম পরমাণু।

কিন্তু একটা নতুন রহস্য যে দেখা দিলো তার কি হবে?

সে রহস্য হলো অন্য পরমাণু থেকে কি ভাবে হিলিয়াম জন্ম নিলো?

এ রহস্যের সমাধান করতে হলে পরমাণুর গঠন জানতেই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথই খোলা নেই।

কিন্তু একটা ধনাত্মক কণিকা যা ইলেকট্রনের বিপরীত, যার জন্যেই পরমাণুতে কোন বৈদ্যুতিক প্রবাহ থাকে না, তাকে খুঁজে পাওয়া বেশ কয়েক বছরের মধ্যেও সম্ভব হলো না।

কিন্তু এতে রাদারফোর্ডের মতো বিজ্ঞানী মুষড়ে পড়লেন না। তিনি নানা জটিল পরীক্ষার পর ব্যাখ্যা করলেন যে পরমাণুর মধ্যে জমা আছে এক কেন্দ্রীভূত চার্জ যা খুব ছোট আয়তনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে।

১৯১১ সাল এসে গেলো। পরের বছর রাদারফোর্ড ওই কেন্দ্রীভূত চার্জের একটা নামকরণ করলেন। তিনি বললেন পরমাণুর একটা কেন্দ্র আছে।

এই প্রথম পরমাণু সম্পর্কে একটা আধুনিক ধারণা জন্ম নিলো।

আর পরমাণুর আকৃতি?

পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে রাদারফোর্ড বললেন, পরমাণু হলো একটা ছোট্ট কঠিন ধনাত্মক পদার্থের কেন্দ্র যার চারপাশে সৌর জগতের মতোই ঋণাত্মক

চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রনেরা ঘুরে বেড়ায় কক্ষপথ বেয়ে।

এ ঠিক সূর্যের মতো।

সূর্য যেমন তার চারপাশের গ্রহের কক্ষপথের তুলনায় নেহাতই ছোট্ট, সেই রকম পরমাণু কেন্দ্রও ইলেকট্রনের কক্ষপথের তুলনায় নেহাতই ছোট্ট বলা চলে। পরমাণু কেন্দ্র যেন সূর্য আর ইলেকট্রন হলো গ্রহ।

এতে কি দেখা গেলো ?

দেখা গেলো এই প্রথম মানুষ বুঝলো পদার্থ আসলে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ভরা, যার মধ্যে ছড়ানো পরামাণুর সেই কেন্দ্র।

একেবারে যেন নক্ষত্রজগৎ।

আরও অনেক কিছুই যেন এই ধারণার ফলে পরিষ্কার হয়ে গেলো।

পদার্থের ওই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার ধারণার ফলে বোঝা গেলো বিটা আর আলফা কণিকারা কেন কঠিন পদার্থ ভেদ করে যায়।

কিন্তু একটা প্রশ্ন।

প্রশ্নটা হলো, আমাদের চোখের সামনে যে সব কঠিন পদার্থ আমরা প্রতিনিয়ত দেখি তার গায়ে আঘাত করার ফলে যে কোন বস্তুরই তো ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসারই কথা। তাহলে ?

প্রশ্নটা একান্ত জরুরী। রাদারফোর্ড এ প্রশ্নেরও সহজ উত্তর দিলেন।

তিনি ব্যাখ্যা করলেন ইলেকট্রনের মতো ছোট্ট কণা বা আলফার মতো বড় কণা যে কোন পরমাণুর কেন্দ্রের মধ্যের ফাঁকটুকু খুঁজে নিয়ে সহজেই তা ভেদ করে যেতে পারে।

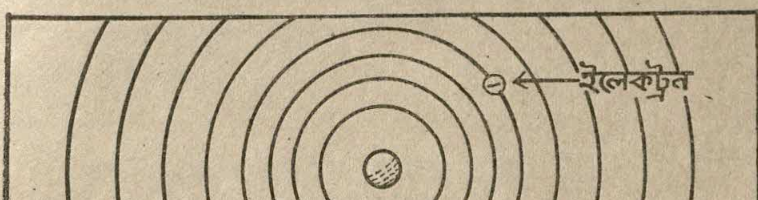
এই ভাবেই তারা কঠিন পদার্থ ভেদ করতে সক্ষম হয়।

এবার তাহলে পরমাণু একটা নির্দিষ্ট আকারই বুঝি নিতে চলেছে—অন্তত জ্ঞানীগুণী, বিজ্ঞান-সচেতন মানুষদের কাছে।

কিন্তু তবুও সব ব্যাপারটাই যেন কল্পনাপ্রসূত। ঠিক ঠিক আসল প্রমাণ কই ? -

রাদারফোর্ড নিজেও বুঝতে পারলেন আরও জোরালো প্রমাণ চাই।

প্রথমেই যে জিনিসটা দরকার, তা হলো ওই ঋণাত্মক ইলেকট্রনের একটা উপযুক্ত ধনাত্মক বিপরীত কিছু তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা। সেটাই হবে



রাদারফোর্ডের পরমাণু

পদার্থের মূল গঠন বুঝিয়ে দেওয়ার একটা উপযুক্ত হাতিয়ার।

কিন্তু বিটা রশ্মির পাশাপাশি আলফা কণিকারা এ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে না।

কারণ ?

কারণ, রাদারফোর্ড দেখলেন আলফা কণিকার ওজন একটা পরিচিত পরমাণুর অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর চার গুণ, আর এর আছে দুটি ধনাত্মক কণিকা।

রাদারফোর্ড সমস্যাটা নিয়ে ১৯১৪ সালে গবেষণা করে চলেছিলেন। তিনি গবেষণার কাজে ব্যবহার করছিলেন ওয়েইনের সেই টিউব যা ওয়েইন ধনাত্মক কণিকা আবিষ্কারের কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

ক্যাথোড রশ্মির সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্যাসকে বিভাজন করে রাদারফোর্ড দেখলেন ওই চূর্ণ হওয়া হাইড্রোজেন পরমাণুর একটা, মাত্র একটাই বৈদ্যুতিক চার্জ আছে।

আর ?

আর রাদারফোর্ড আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সেই ধনাত্মক চার্জের পরিমাপ ঠিক ইলেকট্রনের সমান—তবে ঠিক বিপরীত।

এবার রহস্যটা বুঝতে পেরেছো ?

রাদারফোর্ড আনন্দে ফেটে পড়লেন।

কিন্তু কেন ?

কারণ রাদারফোর্ড বুঝতে পারলেন যেহেতু হাইড্রোজেন সবচেয়ে সরল মৌলিক পদার্থ—আর সেই জন্যই এর পরমাণুকেও হতে হবে সবচেয়ে সরল পরমাণু।

আর ?

আর তাহলে এটাও ভেবে নেওয়া যায় যে ওই পরমাণু কেন্দ্রে মাত্র একটা ধনাত্মক কণিকা আছে—আর তার চারপাশে কক্ষপথে গ্রহের মতোই ঘুরে চলেছে একটাই মাত্র ইলেকট্রন। আর তারই ফলে তৈরি হয় একটা চার্জবিহীন পরমাণু। এবার কোন রকমে খুব দ্রুত একটা ক্যাথোড রশ্মির সাহায্যে ওই ইলেকট্রনকে কক্ষচ্যুত করতে পারলেই যা পড়ে থাকে তা হলো

একটা মাত্র ধনাত্মক চার্জ সুদ্ধ কেন্দ্রীয় কণিকা।

জিনিসটা তাহলে কিরকম দাঁড়ালো?

জিনিসটা দাঁড়ালো এই যে এত দিনের অনুসন্ধিৎসার শেষ হলো।

পাওয়া গেলো পরমাণুর সেই ধনাত্মক পরিপূরক! রাদারফোর্ড ওই কণিকার নাম দিলেন প্রোটন।

তাহলে এতদিনে আমরা কি পেলাম?

পরমাণুর একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের চোখের সামনে সিনেমার মতোই ফুটে উঠলো।

পুরো ছবিটা এবার কেমন দাঁড়ালো একবার দেখা যাক।

ছবিটা দাঁড়ালো এই রকম:

পরমাণু হলো একটা কঠিন অতি ক্ষুদ্র কণা। এর কেন্দ্রে আছে একটা প্রোটন বা ধনাত্মক কণিকা। আর তার চারপাশে আছে একটা কক্ষপথ—যে কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইলেকট্রন। ওই প্রোটন আর ইলেকট্রনে মিলেমিশে তৈরি হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ চার্জবিহীন একটা নিরেট পরমাণু।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম সেই হাইড্রোজেন কেন্দ্র—অর্থাৎ প্রোটনই হলো পদার্থের গঠনের মূল কথা। এরাই যেন ইটের পর ইট সাজিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করে চলে। এর বৈদ্যুতিক চার্জ হলো ইলেকট্রনের সমান—তবে এর মধ্যেই রয়েছে পদার্থের ওজনের সব মাল-মসলা।

এর ওজন কত?

এর ওজন হলো ইলেকট্রনের ওজনের ১৮৪০ গুণ।

এ পর্যন্ত মোটামুটি ভালই কাটলো। পরমাণু কেন্দ্রে বসবাসকারী প্রোটনই পদার্থের ওজনের মূল কথা আর তাদের মোট সংখ্যা জানতে পারলেই কেন্দ্রের বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনের সংখ্যাও জানতে পারা যায়।

বেশ কথা।

কিন্তু আবার যে একটু গোলমেলে ব্যাপার দেখা দিলো।

কি গোলমাল? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

গোলমালটা হলো প্রোটনের সংখ্যা (অর্থাৎ পারমাণবিক বা অ্যাটমিক ওজন) খুব সহজ সাদাসিধে ব্যাপার হচ্ছে না।

এ ব্যাপারটা বুঝতে হলে এসো আর একবার মেণ্ডেলিফের সেই পিরিয়ডিক টেবলের দিকে একটু তাকানো যাক।

ওই তালিকার দ্বিতীয় মৌলিক পদার্থ হলো হিলিয়াম, আর আগেকার ধারণা মতো এর কেন্দ্রে আছে দুটো ধনাত্মক কণিকা আর হাইড্রোজেনের আছে একটা।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো, এই হিসেব মতো হিলিয়ামের পারমাণবিক ওজন কিন্তু দুই নয়—যা হওয়া আইনত উচিত ছিলো।

সে ওজন তাহলে কত?

হিলিয়ামের পারমাণবিক ওজন হলো চার!

শুধু এখানেই শেষ নয়। পিরিয়ডিক টেবলে আরও অনেক মৌলিক পদার্থের বেলাতেই এ রকম সব গোলমেলে ধাঁধা লাগানো ব্যাপার।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই কেন্দ্রের কণিকার খোঁজ আর তার রহস্য ভেদ করতে না পারলে পরমাণুর ঠিক ঠিক একটা পরিচয় পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না।

কারণ?

কারণ ওই জ্ঞানটুকু ছাড়া কোনক্রমেই জানা যাবে না প্রত্যেক পরমাণুর কক্ষপথে কতগুলো ইলেকট্রন থাকা সম্ভব।

সারা দুনিয়ার পদার্থবিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে ওই ধাঁধার রহস্য ভেদ করতে চেষ্টা শুরু করলেন।

আবার এগিয়ে এলেন সেই রাদারফোর্ড, সারা দুনিয়া যাঁর কাছে ঋণী। কিন্তু ১৯১৩ সালে একজন ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ভ্যান ডেন ব্রোয়েক বললেন, কোন পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা খুব সম্ভব ওই মৌলিক পদার্থের পিরিয়ডিক টেবলে অবস্থান সংখ্যার সমান। যেমন হাইড্রোজেন ১, হিলিয়াম ২, লিথিয়াম ৩ এই রকম।

এ ব্যাপারটার কোন প্রমাণ অবশ্য ব্রোয়েক হাজির করতে পারলেন না।

তবে প্রমাণ মিললো।

প্রমাণ এলো সেই রাদারফোর্ডের গবেষণাগার থেকেই। যে রাদারফোর্ডের সংস্পর্শে এস বহু বিজ্ঞানী দুনিয়াজোড়া নাম কিনেছিলেন।

সেই প্রমাণ দিলেন রাদারফোর্ডের এক তরুণ সহকারী হেনরী মসলে। মসলের দুর্ভাগ্য—আর তাঁর সঙ্গে সারা দুনিয়ারই দুর্ভাগ্য তিনি অল্প বয়সেই গ্যালিপোলির যুদ্ধে মারা যান।

মসলে যে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন সেটা ছিলো খুব জটিল। তিনি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সাহায্যে 'এক্স-রে'কে ছড়িয়ে দেওয়া নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। ওই পরীক্ষার ফল তিনি পিরিয়ডিক টেবলের সব মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কণার প্রতি পদক্ষেপে একটা করে ধনাত্মক কণিকার বৃদ্ধি বলে প্রমাণ করলেন।

এটা হলো একেবারে সঠিক প্রমাণ, গালগল্প নয়। ব্যাপারটা হাইড্রোজেনকে নিয়েই শুরু। যার স্থান হলো ১, চার্জও ১—এতেই বোঝা গেলো যে পিরিয়ডিক টেবলের অবস্থান অনুযায়ীই এটা হয়ে চলেছে। এর পরেই আসছে হিলিয়াম, যার অবস্থান ২, যার চার্জও হবে ২। এর পরেই লিথিয়াম, যার অবস্থান অবশ্যই হতে হবে ৩, চার্জও ৩।

এই ভাবেই মসলে আবার নতুন করে মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবলকে সাজিয়ে দিলেন।

কিন্তু এতে নতুনত্ব কোথায়?

নতুনত্ব কিছু ছিলো বৈকি। একটু খতিয়ে দেখা যাক।

ব্যাপারটা হলো মসলে মেণ্ডেলিফের মতো সাজিয়ে রাখার কাজটা পারমাণবিক ওজন অনুযায়ী না করে করলেন পরমাণু সংখ্যা অনুযায়ী। কিন্তু এতে সব ধাঁধার উত্তর কিন্তু পাওয়া গেলো না।

কিন্তু গোলমালটা কোথায়?

দুর্ভাগ্যবশত গোলমাল একটা থেকেই গেলো। পরমাণু সম্বন্ধে আরও গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে চললেন।

আগেকার পাওয়া সব সূত্র অনুযায়ী পরমাণুর ঠিক ঠিক ওজন তো মিলতে চাইছে না।

প্রোটন আর ইলেকট্রন, এরা দুজনে মিলে সব রহস্য সমাধান করে উঠতে পারলো না। ১৯২০ সালের কাছাকাছি বিজ্ঞানীরা ভাবলেন রহস্য একটা থেকেই যাচ্ছে।

রহস্যটা কি হতে পারে ?

ওই স্বাভাবিক প্রশ্ন নিয়ে ছুনিয়ার প্রায় তিন-তিনটি অঞ্চলের গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা একসঙ্গেই বলতে চাইলেন হয়তো এখনও আবিষ্কৃত হয়নি এমন কোন কণিকা আছে যা প্রোটনের ওজনের সমান অথচ যার কোন চার্জ নেই। ওই রকম কণিকাই প্রোটনের সঙ্গে মিলে ওই পরমাণুর ওজনের মাপকাঠি হতে পারে।

ওই ধরনের একটা কণার কথা শেষ পর্যন্ত আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আর ইংল্যাণ্ডেই অবশ্য জানা গেলো।

ইংল্যাণ্ডে সেটা কে আবিষ্কার করলেন জানো ?

নিঃসন্দেহে সেই অতি বিখ্যাত রাদারফোর্ড ছাড়া আর কে ?

মজার কথা, বিজ্ঞানীরা সেই কণার প্রকৃত কোন প্রমাণ পাওয়ার আগেই তার নামকরণের কাজটুকু আগেই সেরে রাখলেন। এ যেন মানুষ জন্মাবার আগে তার নামকরণ।

সেই কণার নাম দেওয়া হলো নিউট্রন।

গবেষণা চললো পুরোদমে।

নিউট্রন ! নিউট্রন ! বিজ্ঞানীদের মুখে শুধু ওই একটাই কথা। কে প্রথম নিউট্রন আবিষ্কার করে পরমাণুর গঠনরহস্য ভেদ করতে পারে সারা ছুনিয়াই সে কথাটাই ভাবতে শুরু করলো।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা কথাটা ভাবলেও তাঁরা ভালোই জানতেন কাজটা একেবারেই সহজ নয় বরং নেহাতই কঠিন। তার প্রধান কারণ হলো নিউট্রনের কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। এরকম কণাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব কাজই বটে।

মজার কথা রাদারফোর্ডের মতো জেদী মানুষও বলে ফেললেন নিউট্রনকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না।

এভাবেই দশ-দশটা বছর কেটে গেলো। চললো অনেক গবেষণা আর নিষ্ফল প্রয়াস।

এসে গেলো ১৯৩০ সাল।

একটু আশার আলো যেন এবার ফুটতে চাইলো। ছুজন জার্মান বিজ্ঞানী

জানালেন তাঁরা বেরিলিয়াম ধাতুকে রেডিয়ামের আলফা কণার সাহায্যে চূর্ণ করে একটা দারুণ শক্তিশালী ভেদ করার ক্ষমতা শুদ্ধ রশ্মি আবিষ্কার করেছেন।

ব্যাপারটা ওইখানেই থেমে থাকার পর দু বছর পরে মাদাম আর পিয়ের কুরীর মেয়ে ইরিন জোলিও কুরী, যিনি তাঁর মায়ের মতোই বিয়ে করেছিলেন এক বিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক জোলিও কুরীকে, একটা পরীক্ষা করলেন ; তিনিও ছিলেন মাদাম কুরীর মতো এক উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বিজ্ঞানী। কুরী পরিবার সত্যিই এক বিজ্ঞানী পরিবার। ইরিন কুরী ওই বেরিলিয়ামের পরীক্ষা চালিয়ে ওই নতুন রশ্মিকে মোমের সাহায্যে আটকাতে সক্ষম হলেন। তিনি দেখলেন ওই মোম থেকে প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে আসছে প্রোটন।

আবার একটা ধাঁধার জন্ম হলো।

এটা আবার কি ধরনের রশ্মি যা প্রোটনের মতো ভারি কণাকে এমন গতি দিতে সক্ষম ?

এর উত্তর দিলেন জেমস চ্যাডউইক নামে একজন তরুণ বিজ্ঞানী।

তিনি বললেন বেরিলিয়ামের মধ্য থেকে নির্গত রশ্মিকে যদি ভেবে নেওয়া যায় একটা নতুন ধরনের রশ্মি, তাহলে আর রহস্য থাকে না।

আর ?

আর যদি এও ধরে নেওয়া যায় যে ওই বেরিলিয়াম রশ্মি আসলে প্রোটনের সমান ওজনের কণায় তৈরি—অথচ যার কোন রকম বৈদ্যুতিক চার্জ নেই।

আসলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ালো ?

দাঁড়ালো এই যে চ্যাডউইক সেই নিউট্রনকেই আবিষ্কার করে বসলেন।

হারানো সূত্রটাই বুঝি এতদিনে খুঁজে পাওয়া গেলো। বিজ্ঞানীদের কাছে নিউট্রনই পরমাণুর একটা পুরোপুরি ছবিই হাজির করলো।

এখন সেই রহস্যময় পারমাণবিক ওজন আর পরমাণুকেন্দ্রিক চার্জের গোলমেলে ব্যাপারটা বোধহয় মিটে গেলো। ওই চার্জ আর ওজনের ব্যাপারটা হলো ওই চার্জবিহীন নিউট্রনের সঙ্গে একসঙ্গে জড়ানো।

হিলিয়ামের রহস্যটা এবার একটু খতিয়ে দেখা যাক এসো।

হিলিয়ামের যদি ওজন হয় চার অথচ চার্জ হয় দুই, তাহলে এর কারণ হলো হিলিয়াম কেন্দ্রে আছে দুটো চার্জ শুদ্ধ কণা (প্রোটন) আর দুটো চার্জ ছাড়া কণা (নিউট্রন)। এই দুয়ে আর দুয়ে মিলে চার—অর্থাৎ হিলিয়ামের ওজন হলো চার।

এই ভাবেই বাকি সব মৌলিক পদার্থেরও ওজন বের করে নেওয়া সম্ভব।

পরমাণুর ছবিটা সকলের সামনে তাহলে এবার বেশ সুন্দর পরিষ্কার হয়েই ফুটে উঠলো বলা চলে, কেমন তাই না ?

যেহেতু, নিউট্রনের কোন চার্জ নেই এবং তারা প্রোটন সংখ্যার সমান হিসেবেই পরমাণু কেন্দ্রে বাস করে সেই জন্যেই আগে দেখা গিয়েছিলো পরমাণুর পারমাণবিক ওজন মোটামুটি এর কেন্দ্রীয় চার্জের দু গুণ।

একটা কাজই এখন শুধু বাকি রইলো।

কাজটা কি রকম ? স্বাভাবিক প্রশ্ন।

কাজটা হলো, পরমাণুর পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার একটা ছবি এঁকে নেওয়ার জন্য এবার পরমাণু কেন্দ্রের চারপাশের কক্ষপথের ঋণাত্মক বা নেগেটিভ চার্জ সুদ্ধ সেই ইলেকট্রনকে সাজিয়ে নেওয়া। ব্যাস, তাহলেই পরমাণুর একটা পুরোপুরি ছবি পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞান এ কাজেও পিছিয়ে রইলো না। কেন্দ্রের ব্যাপারটা জানার পর থেকেই এ ব্যাপারটা সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছিলেন।

তবে একটা কথা।

কথাটা হলো পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের কাজে কিন্তু ওই কেন্দ্র ছাড়া বাইরের ইলেকট্রনদের কিছুই করণীয় ছিলো না।

হ্যাঁ, পারমাণবিক শক্তির ব্যাপারটা নিয়েই মানুষ এবার ভাবতে শুরু করে দিলো। যেটা ছিলো খুবই স্বাভাবিক। কারণ মানুষ এতদিনে ধারণা করে ফেলেছে পরমাণু কেন্দ্রে নিহিত আছে এক প্রচণ্ড অকল্পনীয় শক্তি। পরমাণুকে জানার পর সেটাই হয়ে দাঁড়ালো অনুসন্ধিৎসু মানুষের একমাত্র কাজ।

কিন্তু সে কাজ করার অগে প্রয়োজন ছিলো পরমাণুর কেন্দ্র আর কক্ষপথ

নিয়ে আরও গবেষণা আর তথ্যের যোগান।

কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা পরমাণু সম্পর্কে মানুষ যা জেনেছিলো সেই ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রনই কিন্তু পরমাণু পরিবারের শেষ কথা নয়।

এর পরেও আবিষ্কার হয় আরও অন্তত এক ডজন বিভিন্ন ক্ষুদ্র কণা। এই আবিষ্কার হয় ১৯৩২ সালের পর থেকেই।

এদের বলা হয় মেসনস।

বিজ্ঞানীদের ধারণা জিনিসগুলো অনেকটা আঠার মতো। ওগুলো যেন পরমাণু কেন্দ্রকে শক্ত করে আটকে রেখে দেয়।

এরকম এক কণা হলো পজিট্রন। ইলেকট্রনের আর একটা ধনাত্মক দোসর। এই পজিট্রন হলো এমন এক কণা তেজস্ক্রিয় পরমাণু যাকে কেন্দ্র থেকে বাইরে ঠেলে দিতে সক্ষম।

কিন্তু একটা কথা। এ আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই।

আমাদের এ কাহিনী মোটামুটি ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রনকে ঘিরেই।

চলো, এবার তাহলে পরমাণু কেন্দ্র আর তার কক্ষপথেই একবার বেড়িয়ে আসা যাক।

॥ দশ ॥

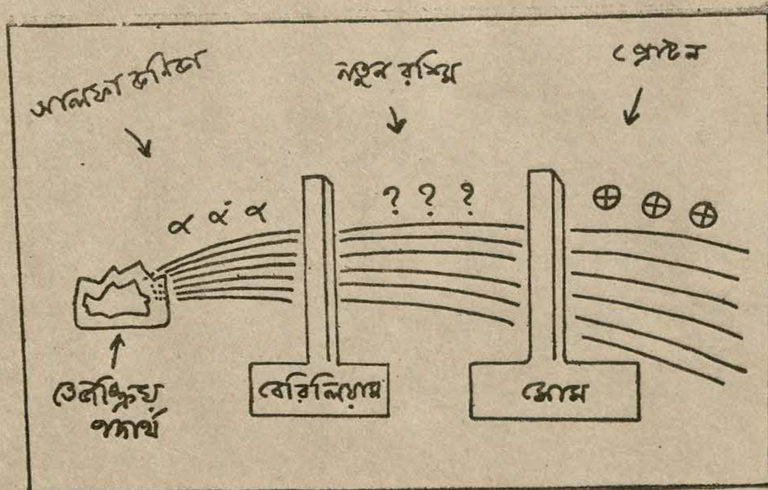
কোয়ানটাম তত্ত্ব

মানুষ প্রথম ইলেকট্রনের দেখা পেয়েছিলো ১৯১১ সালে।

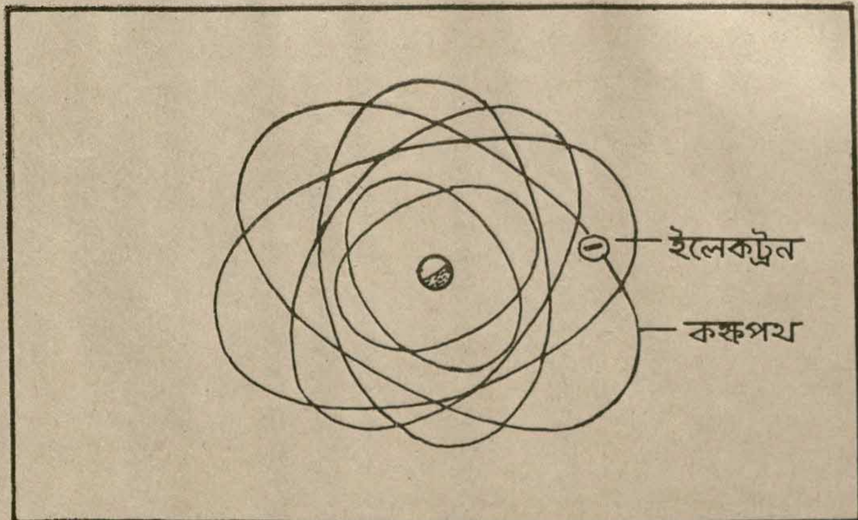
বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ইতিমধ্যে পরমাণুর একটা আলেখ্যও সকলের সামনে হাজির করেছিলেন। মোটামুটি সেটা সকলে গ্রহণও করেছিলেন।

রাদারফোর্ডের পরমাণুর সেই ছবিটা ছিলো এই রকম :

পরমাণু এক-কেন্দ্র বিশিষ্ট। আর তার চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে গ্রহের মতো বিচরণ করে চলেছে ইলেকট্রন। ঠিক যেন সৌরজগৎ।



নতুন এক রশ্মি



বোরের পরমাণু

কিন্তু রাদারফোর্ডের ওই ছবিটায় সামান্য একটু ভুল ছিলো।

সেই ভুলটা হলো, বিদ্যুৎ চুম্বকত্বের নিয়ম অনুযায়ী কোন ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কেন্দ্রের চারপাশে ঋণাত্মক ইলেকট্রন ঘুরপাক খেয়ে চলার ফলে এর শক্তিক্ষয় অবধারিত।

আর তার ফলে শক্তিক্ষয় হতে হতে ওই ইলেকট্রনের কক্ষপথ ক্রমান্বয়ে ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রেই বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু এতে কি ঘটতে পারে ?

ঘটতে পারে এইটুকুই যে পদার্থের তাহলে কোনরকম স্থায়িত্বই থাকে না।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার !

তাহলে এরকম গোলমেলে ব্যাপারটার সমাধান হবে কিভাবে ?

ঠিক।

এ প্রশ্নেরও জবাব মিলে গেলো সেই আর্নেস্ট রাদারফোর্ডেরই গবেষণাগার থেকে।

১৯১৩ সালে রাদারফোর্ডের প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন এক ডেনমার্কবাসী তরুণ বিজ্ঞানী। তাঁর নাম নীলস বোর।

নীলস বোর এমন একটা ব্যাখ্যা হাজির করলেন যাতে অনেকেরই চোখ কপালে উঠে গেলো।

নীলস বোর বললেন কক্ষপথের ইলেকট্রনের সম্বন্ধে ওই সময়ের বিদ্যুৎ-চুম্বকের তত্ত্বটাই একেবারে ভুল। তিনি বললেন ইলেকট্রন কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরার সময় তার কোন শক্তিক্ষয় মোটেই হয় না আর অনন্তকাল ধরে সে ঘুরে চললেও সে কেন্দ্রের মধ্যে মিলিয়েও যায় না।

শুধু কি এইটুকুই জানালেন নীলস বোর ?

না, নীলস বোর এবার তাঁর শিক্ষাগুরু সেই বিখ্যাত আর্নেস্ট রাদার-ফোর্ডের আঁকা পরমাণুর সেই বিখ্যাত ছবিটাও মোটামুটি পালটে দিলেন।

ব্যাপারটা এবার তাহলে কেমন দাঁড়ালো।

ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে নীলস বোর তাঁর ইলেকট্রনদের একই তলের ওপরেই যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়ানোর বন্দোবস্তই করে দিলেন।

ব্যাপারটা হলো বেশ মজার।

তিনি দেখালেন পরমাণুর চারপাশে অনেকগুলো স্থায়ী কক্ষপথ। আর ওই কক্ষপথের ওপরেই ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রনেরা। মজার কথা হলো ওই নানা কক্ষপথের ইলেকট্রনদের মধ্যে শক্তিরও বেশ তারতম্য থাকে।

আরও মজার ব্যাপার, একটা ইলেকট্রন ইচ্ছেমতো এক কক্ষপথ ছেড়ে অন্য কক্ষপথে লাফিয়ে চলে যেতেও পারে। তবে তাদের থেমে পড়ার কোন রকম উপায় অবশ্য থাকে না। ছুটে চলতে চলতেই তারা ওই কক্ষ পরি-বর্তনের কাজটা সেরে নিতে পারে।

ঠিক যেন কতকগুলো দুষ্টু ছেলের লুকোচুরি খেলা আর কি!

নীলস বোর আরও একটা ব্যাখ্যা রাখলেন। তা হলো, কোন পরমাণুর ওপর উচ্চশক্তির কোন রশ্মি প্রয়োগ করলে, কম শক্তির ইলেকট্রন ওই রশ্মি থেকে তার গ্রহণ করার মতো বাড়তি শক্তিটুকু নিয়ে উচ্চশক্তির কক্ষপথে ঢুকে পড়ে।

এতদূর পর্যন্ত তো ভালোয় ভালোয় সব ব্যাপারটাই মিটে গেলো।

কিন্তু বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কিছু নেই।

তাই নীলস বোরের পরমাণুর মধ্যের ওই ইলেকট্রনের ধারণাও শেষ পর্যন্ত আধুনিক যুগে একটু বদলে নেওয়াও দরকার হলো।

সে কাজটা করলেন একজন জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক।

প্ল্যাঙ্ক তাঁর তত্ত্বে জানালেন পরমাণুর ওই ছোট্ট একরত্তি জগৎটায় শক্তি থাকে ছোট একটা প্যাকেটের মধ্যে। অর্থাৎ আগেকার ধারণা মতো তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার বদলে এক জায়গায় বদ্ধ অবস্থাতেই থাকে।

প্ল্যাঙ্কের ওই তত্ত্বের নাম হলো কোয়ানটাম তত্ত্ব।

প্ল্যাঙ্কের ওই তত্ত্বের সাহায্যেই আরও প্রমাণ হলো ইলেকট্রনেরা কেন অনবরত ঘুরতে ঘুরতেও তাদের শক্তি হারায় না।

॥ এগারো ॥

আইনস্টাইনের সূত্র

বিজ্ঞান কখনও থেমে থাকে না। তাই রাদারফোর্ডের আবিষ্কার আর নীলস বোরের পরমাণুর গঠন আর কক্ষপথের ধারণার কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞানীদের চেষ্টা হলো পরমাণুকে চূর্ণ করা।

আশ্চর্যের কথা সেই পরমাণুকে চূর্ণ করার জন্য মানুষকে কোন বিরাট যন্ত্রের সাহায্য নিতে হলো না।

কথাটা একটু আশ্চর্য বলেই হয়তো তোমাদের মনে হবে।

কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই তাই।

কারণ পরমাণু চূর্ণ করার এ রহস্য ভেদ হয়েছিলো একজনের হাতের এক টুকরো পেনসিল আর কাগজে।

সেই একজন কে? তাঁর কথা বলা হয়েছে আগেই একবার, হয়তো ভুলে যাওনি।

সেই মানুষটির প্রচণ্ড প্রতিভার কথা মানুষ তখনও জানতে সক্ষম হয়নি। সুইজারল্যাণ্ডের বের্ন শহরে এক পরীক্ষকের কাজ করছিলেন সেই মানুষটি।

ওখানেই একদিন আলোর গতি আর গতিশীল ইলেকট্রনের আয়তন সম্পর্কে একটা জটিল তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতেই মানুষটি এক খণ্ড কাগজের ওপর হাতের পেনসিল দিয়ে লিখে ফেললেন ঃ

$E = mc^2$

কি সহজ সরল একটা সূত্র !

অথচ এই আপাত সহজ সরল সমীকরণটাই যে বিজ্ঞানের সমস্ত ধ্যান-ধারণার জগতে প্রচণ্ড একটা বিপ্লব শুরু করে পরমাণুর মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রচণ্ড শক্তিকে মুক্তি দেওয়ার পথ খুলে দেবে কে জানতো ?

এবার বুঝতে পেরেছো ওই মানুষটি কে ছিলেন ?

হ্যাঁ, তিনিই ছিলেন সেই প্রচণ্ড প্রতিভাধর বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

এসো, এবার আর একবার আমরা পরমাণুর আদি যুগটায় একটু ফিরে যাই। আবার পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সেই আদি পুরুষ ডেমোক্রিটাসকে।

আড়াই হাজার বছর আগে যে জ্ঞানের শিখা তিনি জ্বেলেছিলেন তার যোগ্য উত্তরসূরী আইনস্টাইন সেই শিখাকে আরও উজ্জ্বল করে তুললেন।

এবার আবার ফিরে যাই এসো আইনস্টাইনের সেই সূত্রের কথায়।

আইনস্টাইনের সেই সূত্র গাঁথা ছিলো তাঁরই আর একটা তত্ত্বের সঙ্গে।

সেই তত্ত্ব কি ?

সেই তত্ত্বের নাম আপেক্ষিক তত্ত্ব।

এই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বেশ একটু জটিল আর নেহাতই গোলমেলে ব্যাপার। আমাদের এ কাহিনীতে ওই তত্ত্ব না বুঝলেও ক্ষতি নেই।

আমাদের প্রয়োজন আইনস্টাইনের সেই সমীকরণ $E = mc^2$ নিয়েই।

আনন্দের কথা এই যে, সমীকরণটা খুব একটা তেমন গোলমেলে আর খুব অবোধ্য ব্যাপার নয়।

তবুও এই সমীকরণের ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার আগে এর উৎপত্তির পেছনে কি আছে একটু দেখে নিই, এসো।

বর্তমান শতাব্দী ঠিক শুরু হওয়ার মুখে বিজ্ঞানের মূল কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে ছিলো দু-দুটো অলঙ্ঘ্য নিয়মের ওপরেই।

সে দুটো নিয়ম কি ?

সেই নিয়ম দুটো হলো :

(১) পদার্থ অক্ষয়, এই নিয়ম (২) শক্তিও অক্ষয়, এই নিয়ম।

অর্থাৎ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে :

প্রথমটির অর্থ হলো, এই পৃথিবীর কোন পদার্থই সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না।

দ্বিতীয়টির অর্থও একই রকম :

শক্তিকেও সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না।

এখানে আবার সেই পুরনো কিছু কথাই এসে পড়লো।

সেই কথাটা কি ?

সেই ফ্রান্সিস বেকনের কথা। তিনিই বলেছিলেন পদার্থের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস না পেয়ে একই থাকে

লাভোসিয়ের কথাও একবার মনে করে দেখো। কি প্রাণপাত পরিশ্রম করেই তিনি সেই জল, কাঁচের পাত্র আর তার তলানির পরীক্ষা করেছিলেন।

পরে আরও পরে, বিজ্ঞানীরা আরও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে লাভোসিয়ের ওই পরীক্ষাকেই আবার যাচাই করেছিলেন। কিন্তু তাঁরাও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে পদার্থের আয়তনের পরিবর্তন ঘটে এ কথা প্রমাণ করতে পারেননি।

ঠিক এই রকম ভাবেই পদার্থবিদেরাও নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে গবেষণা আর পরীক্ষা করেও দেখাতে পারেননি পদার্থের শক্তির কোন রকম হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

তবে এখানে একটা কথা অবশ্যই বলার আছে।

তা হলো, শক্তির অবশ্য পরিবর্তন ঘটতে পারে—তারা এক পদার্থের মধ্য থেকে অন্য পদার্থে ঢুকতে পারে। যেমন আলো বিদ্যুতে পরিণত হতে পারে, তাপ পরিবর্তিত হতে পারে গতিতে—যেমন বাষ্পীয় ইঞ্জিনে।

তবে এখানে দেখা যাচ্ছে শক্তি নতুন ভাবে জন্ম নেয় না, আর তার ধ্বংসও হয় না।

একজন জার্মান বিজ্ঞানী, হারম্যান-লাডউইগ ফার্দিনান্দ ফন হেলম হোলজ্ ওই ব্যাপারটা নিয়ে ১৮৪৭ সালে একটা পরীক্ষা করে ওই নিয়ম প্রকাশ করে বলেছিলেন শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না।

এর মধ্যে একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছো ?

সে ব্যাপারটা হলো, আকার আর শক্তি যে অক্ষয় সে ধারণাটা কিন্তু রাতারাতি গজিয়ে ওঠেনি। এ তত্ত্বে উপনীত হতে বিজ্ঞানকে অনেক অনেক শতাব্দীই পার হতে হয়েছে।

এত করে ব্যাপারটা কোথায় এসে পৌঁছলো এটাই প্রশ্ন।

পৌঁছলো এমন একটা জায়গায় যখন বিজ্ঞান সবেমাত্র অনেক জটিল আর কঠিন স্তর পার হয়ে সবেমাত্র একটু আরাম আর অবকাশ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে চলার ঠিক সন্ধিক্ষণেই ওই তরুণ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সাংঘাতিক একটা সমীকরণের বোমা ছুঁড়ে মারলেন।

সেই সমীকরণ হলো $E = mc^2$.

কিন্তু আইনস্টাইন কি বলতে চেয়েছিলেন এবার একটু তলিয়ে দেখলে ক্ষতি নেই। কি এমন অসম্ভব কথা তিনি বলতে চেয়েছিলেন ছোট্ট ওই কটা শব্দের মধ্য দিয়ে যাতে ওরকম তুলকালাম কাণ্ড ঘটতে পারে?

আইনস্টাইন যা বলতে চেয়েছিলেন সেটা যে সাংঘাতিক তাতে সন্দেহ নেই।

তিনি বলেছিলেন শক্তি অক্ষয় নয়, আর পদার্থও তাই। একটাকে অন্যটায় বদলে নেওয়াও সম্ভব।

আইনস্টাইন ব্যাখ্যা করলেন E অর্থাৎ শক্তি বা এনার্জি হলো কোন 'মাস' বা ভরকে ধ্বংস করার পর যা পাওয়া যায় সেই শক্তি।

এ ব্যাপারটা এমন কিছু, বিজ্ঞান যা স্বপ্নেও সত্যি হতে পারে বলে কোনদিন ভাবতে পারেনি।

আরও সাংঘাতিক যে কথা আইনস্টাইন বললেন তা শুধু ওই পদার্থের পরস্পর পরিবর্তনের ব্যাপারটাই নয়—সেটা হলো, আইনস্টাইন দাবি করলেন ছোট এক কণা পদার্থকে চূর্ণ করতে পারলে প্রচণ্ড এক শক্তির জন্ম হয়।

এ যেন সেই রূপকথার রাক্ষসীর প্রাণভরা পাথরের কৌটো। কৌটো খুললেই বেরিয়ে আসে লক্ষ কোটি রাক্ষসের প্রাণ।

এবার ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

সমীকরণে যে cকে m দিয়ে গুণ করা হয়েছে তা হলো আলোকের গতিবেগ। আর এটা দেওয়া আছে প্রতি সেকেণ্ডে সেন্টিমিটার হিসেবে।

সেটা কত জানো? সেটা হলো তিনের পিঠে দশটা শূন্য।

অর্থাৎ ৩০,০০০,০০০,০০০।

কিন্তু ভালো করে দেখো সমীকরণে রয়েছে cএর বর্গ, অর্থাৎ c^2।

তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে কেমন ? একটু চমকে যাওয়ারই কথা। সেটা দাঁড়াচ্ছে : ৯০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০ !

এই অবস্থায় mকে প্রকাশ করা হচ্ছে গ্রামে আর Eকে আর্গ অর্থাৎ erg নামের এক এককে।

জিনিসটা এবার একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

যদি ধরো, এক গ্রাম কয়লা পোড়ানো যায়—অর্থাৎ এক আউন্সের প্রায় $\frac{১}{৩০}$ ভাগ, তাহলে ওই কয়লা পোড়ানোর পর যে শক্তি উৎপন্ন হবে তার ক্ষমতা দাঁড়াবে লক্ষ কোটি আর্গ।

ব্যাপারটা একটু গোলমেলে লাগছে, তাই না ?

অতএব আরও একটু সহজ ও প্রাঞ্জল করে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

ধরা যাক ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের কোন এক গবেষণাগারে এক পাউণ্ড কয়লার পরমাণু চূর্ণ করে শক্তিতে রূপান্তরিত করা হলো।

তাহলে কি হবে ?

হবে এই যে, এর ফলে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে সেই বিদ্যুৎ প্রায় এক মাস ধরে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড আর ওয়েলসের সব বাড়ির বিদ্যুতের চাহিদা মিটিয়ে চলবে।

আর এক হন্দর কয়লা পোড়ানো হলে যে পারমাণবিক শক্তি জন্ম নেবে তাতে প্রায় দশ বছরের মধ্যে নতুন করে আর বিদ্যুৎ উৎপাদন করার দরকারই হবে না।

মজার ব্যাপারটা কোথায় বুঝেছো ? এতে আর আজকের মতো লোড-সেডিংয়ের ভয় থাকবে না।

আইনস্টাইনের ওই সরল সমীকরণের মূল কথাটা ছিলো ওই রকমই।

কিন্তু সে সময় ওই সমীকরণকে বাস্তবে কাজে লাগাবার মতো কোন পথ কেউ জানতো না, অতএব অনেকেই তাই ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চাইলো না।

কিন্তু যিনি ওই ধারণার জন্ম দিলেন তিনি কি ভাবলেন ?

সেই আইনস্টাইন কিন্তু মুষড়ে পড়লেন না।

তিনি অতি বিনয়ের সঙ্গেই বললেন তাঁর ওই শক্তি চালাচালির ব্যাপাটার

মূল রয়ে গেছে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরেই। ওই সব পরমাণু প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন করে চলেছে। এই কারণেই এদের মধ্য থেকে হাজার হাজার মাইল গতির আলফা আর বিটা কণিকা বেরিয়ে আসতে থাকে।

আর?

আর একটা মজার কথাও বললেন আইনস্টাইন।

তা হলো, ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যের শক্তির কথা প্রমাণ করার জন্য কোন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। আঙুলের স্পর্শেই তা জানা যায়।

যদি কেউ সাহস করে এক খণ্ড রেডিয়াম সল্টের স্ফটিকে আঙুল ঠেকাতে চায় তাহলেই সে অনুভব করে সামান্য উত্তাপ। একটা থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র ওই স্ফটিকে ঠেকালে আরও একটা মজার ব্যাপারও চোখে পড়বে।

সেটা হলো, দেখা যাবে ওই স্ফটিকের উত্তাপ বাইরের উত্তাপের চেয়ে পাঁচ ডিগ্রি বেশি।

এতে কি প্রমাণ হয়?

এতে প্রমাণিত হয় ওই রেডিয়াম স্ফটিক অনবরত তাপ বিকিরণ করে চলেছে।

আর এই তাপ বিকিরণ চলেছে শত শত বছর ধরেই।

এই তাপ বিকিরণের পালা কি তাহলে কোন কালেই কমে আসবে না? এ প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক।

এর জবাব হলো, ১৫৪০ বছর পরে এর ওই তাপ বিকিরণের ক্ষমতা অর্ধেকটা নষ্ট হবে।

বাকি অর্ধেকটা?

বাকি অর্ধেকটার অর্ধেক আবার নষ্ট হবে আরও ১৫৪০ বছর পরে। ওই নিয়মেই চলতে থাকবে প্রক্রিয়াটা।

এ ধরনের অর্ধেক শক্তি হারানোর ব্যাপারটা ঘটে থাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের বেলাতেই। বিজ্ঞানীরা এটা পরীক্ষা করেই দেখেছেন।

ওই নিয়মটার তাই নাম দেওয়া হয় ওই মৌলিক পদার্থের অর্ধেক জীবন কাল বা 'হাফ লাইফ পিরিয়ড'।

মাদাম আর পিয়ের কুরীও তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা ওই প্রচণ্ড শক্তির উৎস সম্পর্কে একটা ধারণা করেছিলেন। ওই ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা দুটো সম্ভাবনার কথাও জানাতে চেয়েছিলেন ঃ

(১) এটা আসছে পরমাণুর অভ্যন্তর থেকেই (২) এর উৎপত্তি পরমাণুর বাইরের চারপাশ থেকে আহরণ করা শক্তি।

রাদারফোর্ড আর ফ্রেডেরিক সডি শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রথম বক্তব্যকেই মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এ কথা যাক।

প্রশ্ন হলো আইনস্টাইনের মূল সেই বক্তব্যের কি হলো ? বেশ কয়েক বছর মানুষ কিন্তু এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চাইলো না।

তারা বলতে চাইলো ব্যাপারটা নিছক একটা কালি-কলমের আঁকিবুঁকি —ওর কোন গুরুত্ব আছে নাকি ?···

গুরুত্ব সত্যিই ছিলো কি না একটু পরেই জানা যাবে।

॥ বারো ॥
সৌরশক্তি

রূপকথার মতো পরমাণু কাহিনী এতদিনে আড়াই হাজার বছর পেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু পরমাণুর তো বয়সের গাছ পাথর নেই। পৃথিবী সৃষ্টির আদিম কাল থেকেই রয়েছে পরমাণু।

তাহলে ওই আড়াই হাজার বছর ?

প্রশ্নটা ঠিকই।

এ আড়াই হাজার বছর হলো মানুষের মাথায় যেদিন পরমাণুর আকৃতি আর চরিত্রটা ধরা পড়েছিলো সেইদিন থেকে আধুনিক এই কাল পর্যন্ত।

আড়াই হাজার বছর কেন বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো ?

হ্যাঁ, সেই গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস যেদিন প্রথম পরমাণুর কথাটা সকলকে জানিয়েছিলেন সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত হিসেব করলে ওই সময়ই দাঁড়ায়।

পরমাণু এখন তাহলে বলা চলে বেশ সাবালক হয়েই দাঁড়িয়েছে আমাদের কাছে। পরমাণু কি ও কেন, আর তার চরিত্র, গঠন, পরিবার, উৎস সব কিছুরই একটা ঠিকুজি আমরা পেয়ে গেছি।

এখন কেবল একটা জিনিসই আমাদের দরকার।

সেটা কি ?

সেটা হলো পরমাণু কেন্দ্রে লুকিয়ে থাকা অফুরন্ত সেই শক্তি ভাণ্ডারের সন্ধান।

ওই শক্তিকে আহরণ করে তাকে মানব কল্যাণে লাগাতে পারলেই তো তার সার্থকতা আর মানুষের অনুসন্ধিৎসার সমাপ্তি।

সে রাস্তাও তো দেখাতে চেয়েছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

কিন্তু··· ? কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তেমন আমল দেয়নি কথাটায়।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা তা বলে চুপ করে বসে থাকেননি। তাঁদের গবেষণাগারে চলেছিলো নানা পরীক্ষা। এই ভাবেই তাঁরা একদিন আবিষ্কার করে বসলেন আইসোটোপ ও আইসোবার।

আইসোটোপ ও আইসোবার। জিনিস দুটো আসলে কি ?

স্বাভাবিক প্রশ্ন।

পরমাণু কেন্দ্র নিয়ে মানুষের অনুসন্ধিৎসা তখনও শেষ হয়নি। তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুর টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া নিয়ে ফ্রেডেরিক সডি আর রাদারফোর্ডের গবেষণার কোন তুলনা ছিলো না। ফ্রেডেরিক সডিই আবিষ্কার করলেন আইসোটোপ।

পরমাণু কেন্দ্রের কথাটা আর একবার মনে করা যাক।

কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রে যদি কোন রকমে বাড়তি কিছু নিউট্রন ঢুকিয়ে দেওয়া যায় বা তা কমিয়ে নেওয়া যায় তাহলে ওই পদার্থের ভৌত বা ফিজিক্যাল ধর্মের পরিবর্তন ঘটে—কিন্তু রাসায়নিক ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। কারণ রাসায়নিক ধর্মটা নির্ভর করে ইলেকট্রনের ওপর।

এরকম পরমাণুকেই বলে আইসোটোপ।

কিন্তু পরমাণু কেন্দ্রে আবার ধনাত্মক চার্জ সুদ্ধ প্রোটন পুরে দিতে পারলে পদার্থের রাসায়নিক ধর্মটাও বদলে যায়। কারণ সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনের সংখ্যাও যায় বেড়ে।

ব্যাপারটা তাহলে কি রকম দাঁড়ায়?

পদার্থের ভৌতিক আর রাসায়নিক দুটো গুণ বদলে পাওয়া যায় এক নতুন জাতের মৌলিক পদার্থ। এই ব্যাপারটার নাম ট্রান্সমিউটেশন বা জাতবদল।

এখন একটা কথা।

কথাটা হলো ওপরের ওই জাতবদল ব্যাপারটা দেখে কিছু পুরনো কাহিনীই হয়তো তোমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে, তাই না?

সেই কাহিনী হলো অ্যালকেমিস্ট বা অপরাসায়নিকদের কাজকর্ম। তাঁরাও তো নতুন পদার্থ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছিলেন।

প্রকৃতির ব্যাপারটাও কেমন বিচিত্র!

এই বিশাল পৃথিবীটাই যেন প্রকৃতির নিজস্ব একটা বিশাল গবেষণাগার। এখানেও চলছে ওই জাতবদল।

প্রকৃতির গবেষণাগারে সবচেয়ে বড় আকারের পরমাণু হলো ইউরেনিয়াম আর থোরিয়াম। দুটোই তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থ দুটোর মধ্য থেকে অনবরত সেই আলফা আর গামা কণিকা নির্গত হতে হতে একটা জাতবদল ঘটে যায়।

শেষ পর্যন্ত ওই মৌলিক পদার্থ দুটোর কি ঘটে জানো?

তেজস্ক্রিয় কণিকাগুলো নিঃশেষ হতে হতে শেষ অবধি ওরা পরিবর্তিত হয়ে পড়ে সীসায়।

কিন্তু এ জটিল ব্যাপারটা থাক। আমরা আলোচনা করতে চাই আইসোটোপ আর আইসোবার নিয়ে।

সহজ সরল কথায় আইসোটোপ হলো একই ধরনের পরমাণু যার ওজন হলো আলাদা।

আবার সেই রকম, আইসোবার হলো বিভিন্ন ধরনের পরমাণু যার ওজন

হলো একই রকম।

কিন্তু একটা কথা।

আমরা আবার পরমাণু কাহিনী থেকে দূরে সরে যাচ্ছি না তো?

না, তা যাচ্ছি না। ওপরের ওই বক্তব্যকে মুখবন্ধ হিসেবেই ধরে নেওয়া যাক।

আবার আমরা ফিরে আসতে পারি আইনস্টাইনের কথায়।

সেই $E = mc^2$।

সেই বিখ্যাত সূত্র।

ব্যাপারটাকে কি মানুষ কেবল এক কালি-কলমের আঁকিবুঁকি বলেই ধরে নেবে?

এ কথার উত্তর পেতে হলে একটা কাজই মানুষের করার ছিলো।

সেই কাজ হলো বিশাল অনাবিল ওই প্রচণ্ড শক্তির উৎস খুঁজে বের করা। আর সেটা করার জন্য মানুষকে তাকাতে হবে সূর্যের দিকে।

একটু অবাক হওয়ারই কথা।

মানুষ যেদিন থেকে আকাশে সূর্যের দেখা পেয়েছে, সেদিন থেকেই সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ভেবেছে সূর্য কি? তারপর মানুষ যখন বুঝে নিলো এ পৃথিবীর সব কিছু, এমন কি তার নিজের জীবনও সূর্যের ওপর নির্ভরশীল, সেইদিন থেকেই সে ভাবতে বসেছে ওই প্রচণ্ড উত্তাপ সূর্য কি ভাবে ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে বসে তৈরি করে চলেছে।

আশ্চর্য হওয়ার কারণ সেই মানুষ ওই রহস্য ভেদ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় একটা তথ্য জানার পরেই সূর্যের ওই প্রচণ্ড শক্তি তৈরি করার রহস্যের সমাধান হয়।

সেই তথ্য হলো তেজস্ক্রিয় ফিসন।

অর্থাৎ পরমাণু চূর্ণ করার কাজ।

এরপর আইনস্টাইনের সূত্র জানার পরেই বিজ্ঞান আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলো। বোঝা গেলো সূর্যের ওই শক্তির উৎস সম্পূর্ণ এক ধ্বংসাত্মক কাজেরই পরিণতি।

কি ধ্বংস ?

সূর্যের দেহেরই কোন অংশ।

প্রথম দিকে অবশ্য সৌরদেহের কোন অংশ কি ভাবে অহরহ শক্তিতে পরিণত হয়ে চলেছে মানুষের বোধগম্য হয়নি।

তারা ভেবেছে এটা কি সৌরদেহের বড় কিছু পরমাণু বিদারণের ফল ?

না কি সমস্ত পরমাণুভরের সম্পূর্ণ ধ্বংসের ফল ?

১৯২৯ সালে এ প্রশ্নের জবাব দিলেন আর. ডি. অ্যাটকিনশন আর এফ. জি. হাউটারম্যানস নামের দুজন বিজ্ঞানী।

তাঁরা বললেন এ কাজ পরমাণু চূর্ণ করা বা ফিসনের মধ্য দিয়ে হয় না, বরং হয় ছোট ছোট পরমাণুর বড় বড় পরমাণুর সঙ্গে মিশ্রণ বা ফিউসন প্রক্রিয়ায়। আর ওই প্রক্রিয়ায় যে ভর বা মাস নষ্ট হয় তাই-ই পরিবর্তিত হয়ে চলে প্রচণ্ড শক্তিতে।

কিন্তু আমাদের কাছে ওই ফিউসন প্রক্রিয়াটা নেহাতই অকল্পনীয় ব্যাপার বলেই মনে হতে পারে।

কারণ ?

কারণ এ কাজে প্রয়োজন এক অকল্পনীয় উঁচু তাপমাত্রা যার মাধ্যমে ধনাত্মক হালকা পরমাণু কেন্দ্রকে কাছাকাছি এনে ওই ফিউসন ঘটানো সম্ভব।

তবে সূর্যের কাছে এ কাজটা নেহাতই ছেলেখেলা ছাড়া অন্য কিছু না। তার কারণ সূর্যের অভ্যন্তরের তাপ সাধারণত তিন কোটি থেকে পাঁচ কোটি ডিগ্রি ফারেনহাইট।

দশ বছর পরে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী এইচ. এ. বেথ সূর্যের ওই শক্তির ব্যাপারটা সম্পর্কে বেশ একটা চমৎকার ব্যাখ্যা হাজির করলেন।

তিনি বললেন সূর্যের ওই শক্তি তৈরির কাজে দরকার হয় হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর হিলিয়াম।

এগুলো আসলে যেন কোন রান্নার মশলাপাতি। রান্নার প্রক্রিয়াটা হলো এই রকম :

চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু এক সঙ্গে মিশিয়ে প্রথমে তৈরি হলো একটা হিলিয়াম কেন্দ্র আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বাড়তি শক্তি।

কিন্তু এ কাহিনীর সঙ্গে মানুষের আবিষ্কার করা পরমাণু বিজ্ঞানের সম্পর্ক কোথায়?

প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক।

সম্পর্ক একটা আছে। সেটা হলো সূর্য যে প্রক্রিয়ায় তার বুকে ওই প্রচণ্ড শক্তি তৈরি করে চলেছে মানুষও কি সেই পদ্ধতিতে এটা তৈরি করতে পারবে না?

বিজ্ঞানীরা বললেন, হ্যাঁ, সম্ভব। প্রক্রিয়াটা হলো সেই ফিসন প্রক্রিয়া।

আর তাই শেষ পর্যন্ত মানুষ সেই পথেই একটু দ্বিধার সঙ্গে এগিয়ে চলতে চাইলো।

॥ তেরো ॥

পরমাণু কেন্দ্র ভাঙছে

বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের নাম নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি কেউ।

পরমাণু বিজ্ঞান জগতে সবচেয়ে পরিচিত আর উচ্চারিত নাম আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। নানা রকম গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করে চলেছিলেন রাদারফোর্ড।

উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য ছিলো একটাই। পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করে সেই অফুরন্ত শক্তি ভাণ্ডারের উৎসমুখ খুলে ধরা।

কিন্তু এটা কি সম্ভব হবে?

রাদারফোর্ড হার মানলেন না। হার মানবার মতো মানুষ তিনি যে ছিলেন না।

ওই পরীক্ষার কাজে তিনি এক সময় ব্যবহার করলেন নাইট্রোজেন গ্যাস। যে গ্যাস আমাদের চারদিকের বায়ুস্তরের প্রায় $\frac{8}{5}$ অংশ জুড়ে ছড়িয়ে

আছে। রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে আলফা কণিকা দিয়ে আঘাত করলেন।

ফল কি হলো ?

ফল হলো এই, রাদারফোর্ড দেখলেন তাঁর আলফা কণিকারা নাইট্রোজেন পরমাণুর গায়ে আছড়ে পড়তেই গ্যাস টিউব থেকে চার্জসুদ্ধ নাইট্রোজেন কেন্দ্র না বেরিয়ে, বেরিয়ে এলো প্রোটন—অর্থাৎ গ্যাসটা যেন নাইট্রোজেন না হয়ে মনে হতে চাইলো হাইড্রোজেন।

অথচ রাদারফোর্ড ভালো করেই জানতেন তাঁর টিউবে হাইড্রোজেনের কণামাত্র চিহ্নও ছিলো না।

তাহলে কিভাবে এটা হতে পারে ?

এর একটাই মাত্র ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব।

সেটা হলোঃ দ্রুতগামী আলফা কণিকাদের সংস্পর্শে আসার পর নাইট্রোজেন পরমাণুরা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

এ যে সাংঘাতিক আবিষ্কার !

পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ হওয়ার এই তো প্রথম খবর ! তাহলে কি সত্যিই শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তির উৎসমুখ খুলে গেলো ?

কিন্তু তা নয়।

এত সহজে তা হলো না।

রাদারফোর্ডের এ আবিষ্কার পরমাণু বিজ্ঞানকে আরও বহুদূর হয়তো এগিয়ে নিয়ে গেলো বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোপুরি আত্মতুষ্টির সময় তখনও আসেনি।

রাদারফোর্ডের ওই পরীক্ষার ওপর এবার আলোকপাত করলেন আর একজন ইংরাজ বিজ্ঞানী প্যাট্রিক মেনার্ড স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকেট। তরুণ সাতাশ বছর বয়সের এক প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট। ১৯২৫ সালে রাদারফোর্ডের নাইট্রোজেন গ্যাসে আলফা কণিকার আক্রমণের একটা ছবি তুললেন ব্ল্যাকেট জিঙ্ক সালফাইড পর্দার ওপর।

পরীক্ষার আসল ফলাফলটা তাহলে কি রকম দাঁড়ালো ?

দাঁড়ালো এই, একটা হিলিয়াম কেন্দ্র (অর্থাৎ আলফা কণিকা)

নাইট্রোজেন কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে জন্ম হয়েছে একটা হাইড্রোজেন কেন্দ্রের (অর্থাৎ প্রোটন) আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পরমাণু কেন্দ্রের ।

আবার যেন একটা গোলমেলে ব্যাপারই জন্ম নিতে চাইলো ।

সেই গোলমেলে ব্যাপারটা হলো, ওই হাইড্রোজেন কেন্দ্র বা প্রোটন জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর সঙ্গে জন্ম নেওয়া সেই আর এক পরমাণুর ব্যাপারটা।

আরও একটু বিশদ করে বলতে চাইলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে আলফা কণিকারা যখন আকারে বড় কোন পরমাণু কেন্দ্রের কাছাকাছি এসে পড়ে, ওই বড় আকারের পরমাণু কেন্দ্র আলফা কণিকাকে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে থাকে ।

অর্থাৎ প্রকৃতির নানা পদার্থের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা কণিকাদের দিয়ে পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করার একটা সীমা আছে। তারা সব কেন্দ্রকে চুরমার করতে আদৌ সক্ষম হয় না। কিছু মৌলিক পদার্থের বড় আকারের ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট কেন্দ্রের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেওয়ার শক্তি প্রাকৃতিক আলফা কণিকাদের নেই ।

তাহলে কি পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করার মানুষের আগ্রহের সমাধি ওখানেই ?

না, কারণ বিজ্ঞানে অসম্ভব বলে কিছু নেই ।

বিজ্ঞানীরা এবার বুঝলেন পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করার কাজে আরও শক্তি-শালী কণিকাই প্রয়োজন ।

আর সে কণিকা প্রকৃতিতে লভ্য ওই আলফা কণিকার বদলে কোন কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট কণিকাই প্রয়োজন—যার ক্ষমতা হবে অনেক অনেক বেশি।

বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে প্রোটনের কথা ভাবলেন, এর ছোট্ট আকার আর ছোট্ট চার্জের জন্য প্রোটন হয়তো এ বাধা কাটিয়ে উঠে পরমাণু কেন্দ্র ভেদ করতে পারবে । এ যেন একটা রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ।

বেশ কয়েক বছরের অপেক্ষার পর ১৯৩২ সালে সেই রাদারফোর্ডের দুজন ছাত্র এরকম অস্ত্র আবিষ্কার করে সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিলেন । তাঁরা সারা দুনিয়াকে অবাক করে দিয়ে জানালেন এক কৃত্রিম উপায়ে তাঁরা

পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করে এর অভ্যন্তরের অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডারকে খুলে দেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

মানুষের স্বপ্ন বুঝি এবার সত্যি হতে চললো।

যে দুজন বিজ্ঞানী এ কাজে সফল হলেন তাঁরা বয়সে নেহাত তরুণ। একজন আর্নেস্ট টমাস সিনটন ওয়াল্টনের বয়স মাত্র ২৯ বছর, অন্যজন জন ডগলাস ককক্রফটের মাত্র ৩৪।

এরপর?

এর পরের পরিস্থিতি দেখা যাবে পরের পরিচ্ছেদেই।

॥ চোদ্দ ॥
আরও তথ্য

ওয়াল্টন আর ককক্রফটের আবিষ্কৃত পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করার সেই ঘটনার কথা আগেই শুনেছো।

কিন্তু কি সেই পদ্ধতি যার সাহায্যে পরমাণু কেন্দ্রকে চূর্ণ করে তার ভেতরের অফুরন্ত শক্তি বাইরে বের করে আনা যায়?

এ যেন আলিবাবার সেই রত্নগুহার দরজা খুলে ধরা।

দরকার শুধু সেই সঙ্কেতের। চিচিং ফাঁক।

সেই সঙ্কেতকেই আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানী দুজন। পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করার জন্য তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন কিন্তু প্রোটনকে।

হ্যাঁ, তাঁদের আবিষ্কার করা সেই অস্ত্র আমাদের পূর্ব পরিচিত প্রোটন।

কিন্তু ওই বিজ্ঞানীরা গোড়ায় সফল হয়ে একটা চমক আনলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের পদ্ধতিকে বাতিল করতে হলো।

এর কারণ কি?

কারন একটা অবশ্যই ছিলো বৈকি। সে কারণ হলো ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট কেন্দ্র আর প্রোটনের মধ্যের বিকর্ষণই ছিলো

প্রোটনের পক্ষে পরমাণু কেন্দ্র ভেদ করার কাজে প্রধান বাধা। তাছাড়া প্রোটনেরা বারবার কেন্দ্রে আঘাত করতে করতে যেন শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়েই শক্তি হারাতে হারাতে ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলে পরিণত হয়ে পড়ে হাইড্রোজেন পরমাণুতে।

বিজ্ঞানীরা তাই আরও উপযুক্ত অস্ত্রের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। খুব শীগগিরই তাঁরা পেলেন সফলতা।

শেষ পর্যন্ত প্রোটনের চেয়েও অনেক শক্তিশালী আর এক অস্ত্র আবিষ্কার হয়ে গেলো।

আর সে অস্ত্র হলো নিউট্রন।

আশ্চর্যের কথা হলো আমরা সকলেই পরমাণুর কথাই বলতে উৎসুক। বিজ্ঞান জগতের বাইরে নিউট্রন যেন নেহাতই অপরিচিত, অচেনা।

তবুও পরমাণু নাটকে এই নিউট্রনই নায়ক বা খলনায়ক যাই হোক। কারণ শেষ অবধি নিউট্রনই বন্ধ দরজা খুলে দেয়।

পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে এখন তাই বলা দরকার নিউট্রনেরই কথা।

তাই মনে হতে পারে পরমাণু কেন্দ্রের লুকনো শক্তিকে পরমাণু শক্তি না বলে বলা উচিত নিউট্রনিক শক্তি। সেটা বোধহয় অনেক অনেক বেশি উপযুক্ত হতে পারতো। কারণ পরমাণু কেন্দ্রে প্রবেশ করার সময় নিউট্রন যে শক্তি নিয়ে আসে সেটুকু না থাকলে পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করা হয়তো কোন দিনই সম্ভব হতো না।

নিউট্রনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের পালাটা আগেই মিটে গেছে। একে আবিষ্কার করেছিলেন সেই বিজ্ঞানী চ্যাডউইক।

কিন্তু···।

কিন্তু তখন নিউট্রনের পরিচিতি ছিলো শুধু কেন্দ্রের একটা ভারসাম্যই বজায় রাখার জন্য।

আর আজ ?

আর আজ সেই নিউট্রনই পরমাণু শক্তিকে মুক্তি দেওয়ার কাজে একমাত্র চাবিকাঠি।

এবার তাই সেই নিউট্রনের জীবনকথা নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করে নিলে কেমন হয় ?

নিউট্রন একটু ভারি কণাই। প্রোটনের চেয়ে সামান্য কিছু ভারি। প্রোটনের মতোই নিউট্রনের বাস পরমাণু কেন্দ্রে। সেখান থেকে সহজেই নিউট্রনকে বাসচ্যুত করে তীব্র গতিতে ছুটতে বাধ্য করা যায়।

এ কাজ করা সম্ভব খুব শক্তিশালী আলফা কণিকা দিয়ে কোন হালকা মৌলিক পদার্থ, যেমন বেরিলিয়ামের কেন্দ্রে আঘাত করা।

প্রোটনের মতো অবশ্য নিউট্রনের কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই।

এ একটা খুব দরকারী গুণ।

কারণ ?

কারণ নিউট্রনের কোন রকম বৈদ্যুতিক চার্জ না থাকায় সে খুব সহজেই খুব বেশি ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট পরমাণু কেন্দ্রের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে সেই ধনাত্মক চার্জ যুক্ত প্রোটনের সঙ্গে একেবারে করমর্দন করে আসতে পারে।

ব্যাপারটা কেমন মজার বুঝতে পারছো ?

ব্যাপারটা হলো প্রোটনের অত কাছে গা ঘেঁষে দাঁড়ালেও নিউট্রনের গায়ে কোন আঁচড়ও লাগে না। কারণ এর নিজের কোন চার্জই নেই।

এ যেন বিদ্যুৎ ছুঁলেও শক্ না লাগার মতো ব্যাপার।

ব্যাপারটার গুরুত্ব কি রকম একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে।

এবার তো তাহলে এই নিউট্রনকে দিয়েই পরমাণু কেন্দ্রকে একেবারে চূর্ণ করে ফেলা যায়।

ঠিক এই রকম কিছুই বিজ্ঞানীরা প্রাণপণে খুঁজে চলেছিলেন।

এই ব্যাপারটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ১৯৩৫ সালে একদল ইতালীয় বিজ্ঞানী। তাঁদের নেতা ছিলেন এনরিকো ফারমী নামে একজন খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী। হিটলারের নাৎসী জার্মানী থেকে তিনি লাভ করেছিলেন নির্বাসন। ফারমী আর তাঁর সহকারীরা ওই চার্জবিহীন কণাদের পরমাণু কেন্দ্রে আশ্চর্যজনক ব্যবহার করতে দেখে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন।

তাঁরা দেখলেন, হাইড্রোজেন পূর্ণ কোন যৌগিক পদার্থ, যেমন জলে ওই নিউট্রন ঢুকিয়ে দিলে, ওই নিউট্রন ছুটোছুটি কমিয়ে একেবারে শান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

দারুণ আবিষ্কারই বটে। বিজ্ঞানীরা এতদিন পর্যন্ত নানা চার্জ বিশিষ্ট কণিকা, যেমন—ইলেকট্রন, প্রোটন, আলফা কণিকা ইত্যাদির সাহায্যে পরমাণু কেন্দ্র ভেঙে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যে নিউট্রনকে তাঁরা একেবারে পাত্তাই দিতে চাননি সেই চার্জবিহীন নিউট্রনই শেষ পর্যন্ত অসম্ভবকে সম্ভব করে বিজ্ঞান-জগৎকে স্তম্ভিত করে তাক লাগিয়ে দিলো।

সত্যি অবিশ্বাস্য ঘটনাই বটে।

এখন দেখা যাক নিউট্রন আসল কাজটুকু করে কি ভাবে।

কোন পরমাণু কেন্দ্রে কোন নিউট্রনকে ফাঁদে ফেলে ধরার পরেই ওই নিউট্রন তার শক্তি দিয়ে প্রাণপণে ওই পরমাণু কেন্দ্রে আঘাত করে বসে।

ওই আঘাত কম বা বেশি হওয়া অবশ্য নির্ভর করে কেন্দ্রের আবৃতি আর ওই বাইরের নিউট্রনের বয়ে আনা গতিশক্তি বা কাইনেটিক এনার্জিতে।

গতিশক্তি জিনিসটা কি?

গতিশক্তি বা কাইনেটিক এনার্জি ব্যাপারটা হলো গতির শক্তি।

অতএব কোন ছুটন্ত কণিকার গতি যত বেশি তার গতিশক্তির পরিমাণও তত বেশি।

তাহলে কি ঘটছে?

ঘটছে এই : নিউট্রনের পরমাণু কেন্দ্রে ঢোকার কাজটা দুটো ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে। সেটা হলো ওই পরমাণু কেন্দ্রের পৃষ্ঠটান বা সারফেস টেনশান আর নিউট্রনের কেন্দ্রে ভরে দেওয়া বাড়তি শক্তি। আগেরটা বেশি হলে ওই পরমাণু কেন্দ্র খুব উত্তেজিত হবে বটে কিন্তু সেটায় ফাটল ধরে ভেঙে যাবে না।

তাহলে কি ঘটবে?

সেটাই হবে খুব মজার।

যে ব্যাপারটা এতে ঘটবে তা হলো, ওই পরমাণু কেন্দ্র থেকে বাইরে

ছুটে আসবে একটা রশ্মি বা কণা। ওই কাজের ফলে বাড়তি শক্তিটুকু বের করে দিয়ে নিউট্রন শান্তশিষ্ট হয়ে বিশ্রাম নিতে থাকবে।

কিন্তু এর বদলে যদি নিউট্রনের শক্তি বেশি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ওই পরমাণু সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়তে চাইবে।

এ ব্যাপারটার অর্থ হলো পরমাণু কেন্দ্র ভেঙে পড়ছে।

কিন্তু এত সব ব্যাপার নিছক কোন তত্ত্ব নয়। সবঘটনাটাই ঘটেছে বিজ্ঞানীদের প্রায় চোখের সামনেই পরমাণু কেন্দ্র কোন নিউট্রনকে ফাঁদে আটকে ফেলার পরেই !

পরমাণু কেন্দ্রে নিউট্রন আঘাত করার পর তিন তিনটে ঘটনাই ঘটে। যেমন ঃ

প্রথমটা হলো 'রেডিয়েটিভ ক্যাপচার' যাকে বলা চলতে পারে বিকিরিত গ্রেপ্তার—এতে কোন পরমাণু কেন্দ্র নিউট্রনকে আটক করে কিছু গামা রশ্মি বিকিরণ করে চলে (এ রশ্মি খুব ছোট্ট শক্তিশালী এক্স-রে)।

দ্বিতীয়টা হলো কিছু কণিকার বিচ্ছুরণ—সেই কণিকা হলো প্রোটন, আলফা কণিকা বা আর একটা নিউট্রন বা ভারি হাইড্রোজেন কেন্দ্র ডয়টেরন।

আর তৃতীয় ব্যাপারটা হলো, ফিসন—এতে নিউট্রন পরমাণু কেন্দ্র আক্রমণ করার পর ওই পরমাণু কেন্দ্র ভেঙে দুটো বড় প্রায় একই আকারের কণার উৎপত্তি হয়।

কিন্তু ওই রহস্যজনক ঘটনাগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম দুটো ব্যাপারই লক্ষ্য করা সম্ভবপর হয়েছে।

আর ?

আর এ সত্ত্বেও পরমাণু শক্তি উৎপন্ন করার কাজে প্রথম দুটো কাজের তেমন কোন হাত না থাকারই সম্ভাবনা।

তাহলে ?

তাহলে আবার আমরা ফিরে আসছি তৃতীয় ব্যাপার সেই ফিসন প্রক্রিয়ায়। শেষ অবধি ওই ফিসনই পারমাণবিক শক্তির উৎপাদনের কাজে একমাত্র আশা ভরসা হয়ে দাঁড়ালো।

এখন যে প্রশ্নটা বিজ্ঞানীদের সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াতে চাইলো

তা হলো সত্যিই কি ফিসন সম্ভব ?

বাস্তবে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউই কোন পরমাণু কেন্দ্রকে টুকরো হয়ে দুটো সমান আকারের কেন্দ্রে ভেঙে পড়তে দেখেনি।

সারা বিজ্ঞান জগতের দৃষ্টি এবার তাই পড়তে চাইলো ওই ফিসন বা পরমাণু বিভাজনের ওপরেই।

॥ পনেরো ॥

পারমাণবিক শক্তি

১৯৩৯ সাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া নেমে এসেছে সারা ইউরোপের আকাশ জুড়ে।

জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা নাৎসী নেতা হের হিটলারের হিংস্র গেস্টাপোর তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়ে পালালেন দুজন বিজ্ঞানী। তাঁদের একজন এক মহিলা, নাম প্রফেসর লিজ মিৎসনার, অন্যজন ডঃ ও. আর. ফ্রিশচ।

দুজনেই ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী। তাঁদেরও গবেষণা সেই পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কেই। তাঁরাও চেষ্টা করছিলেন পরমাণু কেন্দ্র ভেঙে পরমাণু শক্তির উৎসমুখ খুলে ধরতে।

আরও একজন বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানীও জার্মানীতে বসে ওই একই চেষ্টা করে চলেছিলেন। সেই প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর নাম প্রফেসর অটো হান।

ওপরের তিনজন বিজ্ঞানীরই অভিজ্ঞতা ছিলো যদি ইউরেনিয়াম পরমাণু কোন রকমে নিউট্রন কণাকে আটকে ফেলতে সক্ষম হয় তাহলে এতে নিশ্চয়ই জন্ম নেবে বড় আকারের কোন পরমাণু বা ছোট আকারের একটা বা দুটো কণা।

অটো হান আর তাঁর অন্যান্য সহকারীরা এই রকম ছোট ইউরেনিয়াম কণাকে রেডিয়ামের একটা আইসোটোপ বলে মনে করেছিলেন।

কিন্তু এর পরেই অটো হান আর তাঁর সহকারীরা একটু মুষড়ে পড়লেন, যখন মাদাম জোলিও কুরী জানালেন হানের ওই আইসোটোপ সম্ভবত ইউরেনিয়ামের কোন আইসোটোপ নয়—সেটা আরও ছোট কোন পরমাণুর আইসোটোপ। সেই ছোট পরমাণু হলো রেডিয়ামের।

আইসোটোপের কথাটা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি কেউ?

অটো হান আর তাঁর সহকর্মীরা কিন্তু পরমাণু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তখনও পর্যন্ত জানা কোন পদ্ধতিতেই ইউরেনিয়ামের পরমাণুর মতো বড় পরমাণুর রেডিয়ামের মতো ছোট পরমাণুতে পরিণত হওয়ার পথ থাকতে পারে বলে বুঝতে পারলেন না।

কিন্তু মিংসনার আর ফ্রিশচ ছিলেন একেবারে আলাদা ধাতুর মানুষ। তাঁরা অটো হানের প্রকাশিত ওই বিষয়ের ওপর একটা প্রবন্ধ পড়েই ওই রহস্য সমাধান করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরাই প্রথম প্রমাণ করে দেখালেন পরমাণু শক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব।

মিংসনার আর ফ্রিশচ জানালেন ইউরেনিয়াম কেন্দ্রের স্থায়িত্ব বড় কম, আর সেই কারণেই নিউট্রন আঘাত করার পরমুহূর্তেই সেই কেন্দ্র সহজেই দুটো প্রায় সমান আকারের কেন্দ্রে ভাগ হয়ে যায়।

দুটো প্রায় সমান আকারের কেন্দ্র!

তাহলে এটাই তো সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত পরমাণু বিভাজন বা ফিসন।

ওই দুটো কেন্দ্রের মধ্যের মোট গতিশক্তি কত?

এর জবাব হলো প্রায় ২০০ মেভ বা Mev.।

মেভ ব্যাপারটা কি? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

পরমাণু কণার শক্তি যে এককের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে তার নাম হলো ইলেকট্রন ভোল্ট।

আর মেভ হলো ১,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট। অর্থাৎ দশ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট!

তাহলে ২০০ মেভের শক্তি দাঁড়ালো কত?

একটা অকল্পনীয় সংখ্যাই।

একটা ভেঙেপড়া পরমাণু থেকে কুড়ি কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট—পরমাণু

বিভাজনের পর আগে পাওয়া শক্তির চেয়ে এ যে দশগুণ বেশি।

ব্যাপারটা কি এবার বুঝতে পেরেছো ?

এই তো তাহলে সেই পারমাণবিক শক্তি ! সেই সাত রাজার ধন এক মাণিক !

ওই কাহিনী দারুণ দ্রুততার সঙ্গেই সারা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো। পদার্থবিজ্ঞানীরা সংশয় আর বিশ্বাসের দোলায় দোল খেতে খেতে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন গবেষণাগারগুলোয় ওই কাহিনীর সত্যতা যাচাই করে নিতে।

ইউরেনিয়াম ফিসনের ব্যাপারটা সত্যিই তো ? এই একটা প্রশ্নই শুধু জাগলো সকলের মনে।

এবার কি হলো ?

বহু গবেষণাগার থেকেই এ কাহিনীর সত্যতার প্রমাণ এসে পৌছলো। বিজ্ঞানীরা ওই একটা ব্যাপার নিয়েই মেতে উঠলেন।

কিন্তু একটা প্রশ্ন।

প্রশ্নটা কি ?

প্রশ্নটা হলো ইউরেনিয়াম ফিসনের আসল রহস্যটা কোথায় ?

এটা বুঝতে হলে আর একবার তাকাতে হবে মেণ্ডেলিফের সেই পিরিয়ডিক টেবলের দিকে।

যে সব পদার্থের কেন্দ্র খুব ছোট, যেমন হিলিয়াম, কারবন, অক্সিজেন, এই রকম—এরা এদের প্রোটন সংখ্যার অনুপাতেই নিউট্রনকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে—কিন্তু ওই পিরিয়ডিক টেবলের ২০ নম্বর ক্যালসিয়ামকে ছাড়ালেই পদার্থের কেন্দ্ররা প্রোটনের চেয়ে বেশি নিউট্রন চাইতে থাকে।

কেমন মজার ব্যাপার একবার ভাবো।

প্রথম দিকে তারা একটা বা দুটো নিউট্রন পেলেই সন্তুষ্ট থাকে বটে, কিন্তু ওই টেবল ধরে আরও একটু নেমে আসার পর পরমাণু কেন্দ্রের স্থায়িত্বের জন্য তাদের নিউট্রনের চাহিদাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলে।

আর ইউরেনিয়ামের কাছে পৌছলেই (যার নম্বর হলো ৯২) তার আছে কেন্দ্রে প্রোটনের চেয়ে আরও ৫৪টা বেশি নিউট্রন !

রহস্যটা বুঝতে পারছো ?

যখন বড় আকারের কোন ইউরেনিয়াম পরমাণু তার বাড়তি ৫৪টা নিউট্রন নিয়ে দু টুকরো হয়ে পড়ে তখন কিন্তু ওই ভাঙা ছোট কেন্দ্রের অতগুলো নিউট্রনের দরকার হয় না।

তাহলে ওই বাড়তি নিউট্রন নিয়ে পরমাণু কেন্দ্র কি করতে চায় ?

এর উত্তর হলো : প্রথম দিকে সে কিছু ইলেকট্রন নিক্ষেপ করে ওই নিউট্রন পরিবর্তিত করে ফেলতে পারে। এর ফলে নিউট্রনের সংখ্যা যায় কমে আর বাড়তে থাকে প্রোটন সংখ্যা। এবার পাল্লা হয় সমান সমান।

বিজ্ঞানীরা আরও একটা ব্যাপারও দেখলেন।

সেটা হলো, ইউরেনিয়াম ফিসনের ফলে আরও মুক্ত নিউট্রনের জন্ম হতে থাকে।

বিজ্ঞানীরা আরও দেখলেন এর হিসেবটা হলো প্রতিটা ইউরেনিয়াম পরমাণু কেন্দ্র ভেঙে যাওয়ার পর তিন থেকে চারটে নিউট্রন বেরিয়ে আসে।

তারপর আবার সেই পাল্লা ঠিক করার কাজ।

এখন প্রশ্ন রইলো একটারই।

সেটা হলো, সব ইউরেনিয়ামেই কি ফিসন সম্ভব ?

সব ইউরেনিয়াম ! এ রকম গোলমেলে কথার অর্থ কি ?

এর জবাব পেতে হলে আবার ফিরে যেতে হবে আইসোটোপের কথায়। বহু মৌলিক পদার্থের মতো ইউরেনিয়ামেরও আছে আইসোটোপ।

অর্থাৎ একই ধরনের পরমাণু কিন্তু পারমাণবিক ওজন আলাদা।

ইউরেনিয়ামের আছে দুটো প্রধান আইসোটোপ।

একটার পারমাণবিক ওজন ২৩৮ যাকে বলা হয় ইউ—২৩৮, অন্যটার ওজন ২৩৫ অর্থাৎ যার নাম ইউ—২৩৫।

বিজ্ঞানীরা বহু জটিল গবেষণার পর জানতে পেরেছেন ইউ—২৩৫-এর পরমাণুই সবচেয়ে সহজে ফিসনযোগ্য। অর্থাৎ এর পরমাণুকেই সহজে ভেঙে ফেলা সম্ভবপর।

এই কারণেই পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টি করার কাজে ব্যবহার করা হয় এই ইউ—২৩৫কেই।

॥ ষোলো ॥

শেষের কথা

আমরা এতক্ষণে এ কাহিনীর প্রায় শেষ পর্যায়েই পৌঁছে গেছি।

আমরা খুঁজে পেয়ে গেছি পরমাণু কেন্দ্রে লুকিয়ে থাকা সেই অফুরন্ত শক্তি ভাণ্ডারের চাবিকাঠি।

কিন্তু এখানেই কি সব কিছুর শেষ? সেই অফুরন্ত শক্তি দিয়ে কি করতে চেয়েছে মানুষ?

হ্যাঁ, সে কথা না জানলে আমাদের এই পরমাণু জীবন রহস্যের সবটুকু জানা হবে না।

এবার আসছে সে কাহিনীই।

আমরা আগেই জেনেছি পরমাণু ফিসনের রহস্য জানা যায় প্রায় ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

কিন্তু তারপরেই মানুষের জীবনে নেমে আসে এক অভিশাপ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ!

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাস। দীর্ঘ এই ছ বছর ধরে সারা পৃথিবীতে চলেছিলো মারণযজ্ঞ। নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কারের নেশায় যুযুধান দেশগুলো যেন নেমে পড়লো প্রতিযোগিতায়।

এরই শেষ পরিণতি পরমাণু বোমা।

পরমাণুর মধ্যে লুকিয়ে থাকা অফুরন্ত ওই শক্তিকে মানুষ প্রথম কাজে লাগালো ওই মারণযজ্ঞে—অজস্র নিরীহ মানুষের মৃত্যুবাণ হিসেবেই। বিচিত্র এক পরিহাসই বটে।

ওই বোমা তৈরির কাজে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখালেন ডঃ ওপেনহাইমার নামে একজন বিজ্ঞানী। ওই বোমা তৈরি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

ওই বোমা তৈরির মশলা হিসেবে ব্যবহার করা হলো সেই ইউরেনিয়াম

আইসোটোপ ইউ—২৩৫। এর মূলও ছিলো সেই ফিসন বা পরমাণু বিভাজন পদ্ধতি।

কিন্তু মজার কথা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ দপ্তর প্রথমে পরমাণু বোমা সম্পর্কে তেমন কোন আগ্রহ দেখাতেই চাননি। পরমাণু বোমা যে তৈরি করা সম্ভব আর তার ধ্বংস ক্ষমতা যে ভয়ঙ্কর হতে পারে এ কথাটাই তাঁরা বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের অনুরোধ উপরোধ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধদপ্তরের কিছু কর্তাব্যক্তির ইচ্ছাতেই পাঁচ বছর পরে ২,০০০,০০০,০০০ ডলার, দীর্ঘ সময় আর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর পরমাণু বোমা তৈরি করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো।

সেই প্রথম বোমাটি পরীক্ষামূলকভাবে ফাটানো হলো ১৬ই জুলাই ১৯৪৫ সালে আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর অ্যালামোর্গডায়।

বোমাটি ফাটানোর পর কি ঘটলো জানো?

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ থেকে জানা গেছে যে এক অভাবিত অকল্পনীয় দৃশ্য। লাল, নীল, বেগুনি, গোলাপি আর আরও নানা রঙের ফুলঝুরি জেগে উঠেছিলো আকাশে।

ত্রিশ সেকেণ্ডের পর জেগে উঠলো এক ভয়াবহ আতঙ্কময় শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে বাতাস। ছ মাইল দূরেও সে বাতাসের ঝাপ্টা মানুষকে ছিটকে ফেলে দিলো।

যে শক্তি এতদিন অন্ধকারে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে লুকনো ছিলো সে আজ ছাড়া পেয়ে যেন লক্ষ কোটি দানবের হুঙ্কারে ঝাঁপিয়ে পড়লো উন্মত্ত আক্রোশে।

তিন সপ্তাহ পরে প্রথম পরমাণু বোমা ফেলা হলো মিত্রপক্ষের তরফে জাপানের হিরোসিমা শহরের বুকে। তিনদিন পরে নাগাসাকিতে।

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো পৃথিবীর বুক থেকে শহর দুটো বুকভরা ব্যথা নিয়ে। নিহত হলো হাজার হাজার নিরীহ মানুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা। আহত আর চিরদিনের মতো অকর্মণ্য হয়ে গেলো আরও হাজার হাজার মানুষ তেজস্ক্রিয় ভস্মের স্পর্শে।

কিন্তু এ ভয়ঙ্কর, অমানবিক অপরাধ মানুষেরই। পরমাণু বোমার নয়। নয় বিজ্ঞানের আবিষ্কারের।

এ যেন আগুন !

আগুন দিয়ে যেমন রান্না করা যায় আর করা চলে মানুষের উপকার, সেই ভাবেই তো চলে সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলা।

আবার এইভাবেই তো মানুষের কল্যাণের কাজেও ব্যবহার করা চলতে পারে পরমাণু শক্তিকে।

মানুষের শুভ বুদ্ধি জেগে উঠেছে। বড় বড় বিজ্ঞানীরা মানব কল্যাণেই লাগাতে চেয়েছেন ওই অফুরন্ত শক্তিকে। সেকথা বলেছেন সেই অ্যালবার্ট আইনস্টাইনও।

ত্রিশ বছর আগে পরমাণু কেন্দ্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই শক্তির সন্ধান যিনি দিয়েছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$-এর মধ্য দিয়ে।

এবার শেষ হলো আড়াই হাজার বছরের পথ পরিক্রমা।

মনে পড়ছে আবার সেই গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের কথা। যিনিই সর্বপ্রথম মানুষকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন ক্ষুদ্র পরমাণুকে। অজ্ঞানতার অন্ধকার মাখা পথ পার হয়ে তারপর থেকেই ধাপে ধাপে চলেছে মানুষের জয়যাত্রা।

এ রূপকথার কাহিনী এখানেই শেষ। কিন্তু শেষ হলেও মানুষের জয়যাত্রা থেমে যায়নি। এগিয়ে চলেছে মানুষ।

এখন শুধু আমরা দৃষ্টি মেলে ধরবো আগামী কালের দিকে।

মানুষের শুভবুদ্ধি যেদিন নিজেকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে না নিয়ে কল্যাণের পথেই এগিয়ে নিয়ে চলতে শিখবে।

সে কাজের শুভ উদ্বোধন ঘটেছে অন্যান্য অনেক দেশের মতো আমাদের এ দেশ ভারতেও। শান্তি আর মানব কল্যাণের কাজে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহার করার জন্য শপথ নিয়েছে দেশবাসী।

এটুকুই একমাত্র সান্ত্বনার কথা।

*